৭৫

নভেম্বর, ২০২৪

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

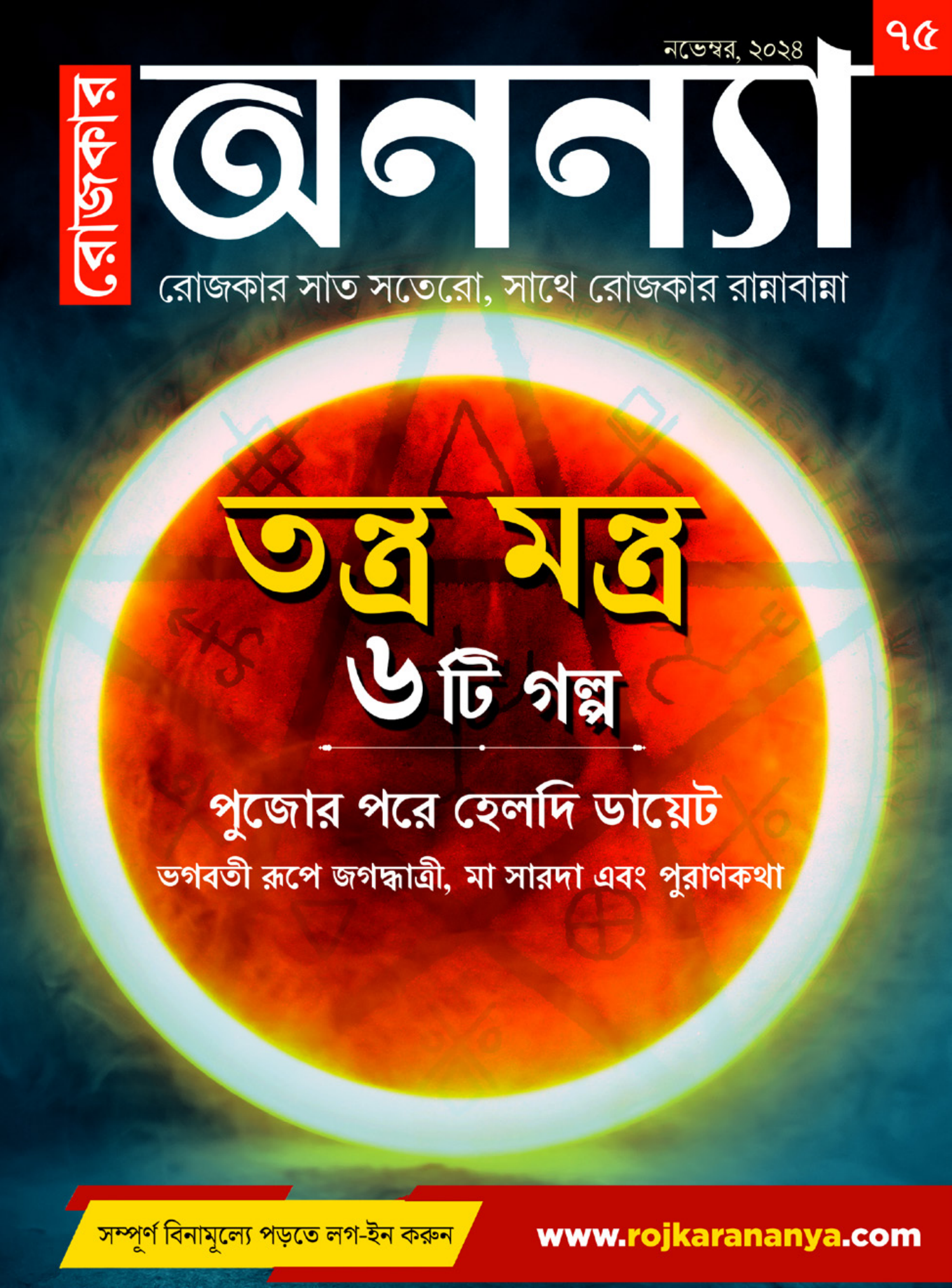

তন্ত্র মন্ত্র

৬ টি গল্প

পুজোর পরে হেলদি ডায়েট

ভগবতী রূপে জগদ্ধাত্রী, মা সারদা এবং পুরাণকথা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন

www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

ঠিক দু'দিন আগেই চলে গেল কালীপুজো। কার্তিক অমাবস্যার রাতটি সবচেয়ে অন্ধকার রাত, সবচেয়ে ভয়ংকর রাত। আমাদের বিশ্বাস ভূত চতুর্দশীর রাত্রে 'তেনারা' নামেন, আসেন ধরায়। সেসব অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তেমনই একজনের অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে এই সংখ্যায়।

কার্তিক অমাবস্যার রাত্রে তন্ত্রসাধনায় বসেন বহু তান্ত্রিক। সেকথা আমরা সবাই শুনেছি। সবমিলিয়ে এটি 'তন্ত্রমন্ত্র'-এর রাত্রি। তান্ত্রিক, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে ছয় লেখকের ছ'টি গল্প সংকলিত হয়েছে এই সংখ্যায়। প্রতিটি গল্পই বেশ শিহরন জাগানো, গা-ছমছমে। তবে ভূত নয়। অর্থাৎ কোনওটাই ভূতের নয়। আশা করি, পাঠকদের ভাল লাগবে।

কালীপুজোর কয়েকদিন পরই জগদ্ধাত্রী পুজো। বাঙালির সেরা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। এই জগদ্ধাত্রীপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি। জগদ্ধাত্রী এবং সারদা মা অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছেন। মা তাঁর আসল রূপ দেখিয়েছিলেন একবার। তিনি কে? জগদ্ধাত্রী বিষয়ক একটি লেখাও আছে এই সংখ্যায়।

বাঙালির ঔৎসুক্য এবং মনের আশা মেটাবে হয়তো এই লেখাটি।

পুজোর ক'দিন খাওয়াদাওয়া হয়েছে প্রচুর। কোনও বাধা নিষেধ না-মেনে। তাই পুজোর আগে যতটা ডায়েট করে নিজেকে তন্বী রেখেছিলেন ততটাই আবার আগের দিনে ফিরে গেছেন। তাই আপনাদের সচেতন করতে 'হেলদি ডায়েট'-এর পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের রন্ধন বিশেষজ্ঞ। সবমিলিয়ে এই সংখ্যাটিকে আকর্ষক করার চেষ্টা করেছি প্রতিবারের মতো।

সবাইকে শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা। সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ধন্যবাদান্তে

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

রোজকার অনন্যা পরিবার

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: ৬২৯০৪৩০৪৯৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: ৭৯৮০৫৬৮৩৭২ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2015/64960

স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ
এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

As Pure as Mother's Love...

100% Pure
Edible
Coconut Oil

100% Vegetarian

Shalimar's®
COCONUT OIL

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না
নভেম্বর ২০২৪

গল্প

কাপালিক ঠাকুরদা, বটুক ভৈরব ১৬
শোভনলাল আধারকার

মনে মন্ত্র, তনুতে তন্ত্র ৩৯
সুবীর মুখোপাধ্যায়

বাদুর পিশাচ ও সেই তান্ত্রিক ৩১
ফটিকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরব তান্ত্রিকের মায়াজগত ৪৮
দেবনারায়ণ দাস

তারাপীঠের সেই ভয়ঙ্কর রাত ২৪
আর্যভট্ট

এবং মধুসুন্দরী দেবী ৫২
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

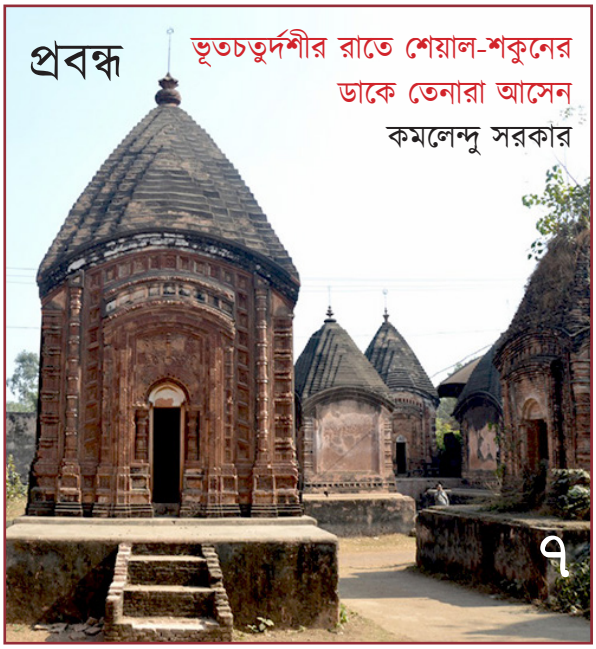

প্রবন্ধ
ভূতচতুর্দশীর রাতে শেয়াল-শকুনের ডাকে তেনারা আসেন
কমলেন্দু সরকার ৭

প্রবন্ধ
ভগবতী রূপে জগদ্ধাত্রী, মা সারদা এবং পুরাণকথা ৬৬

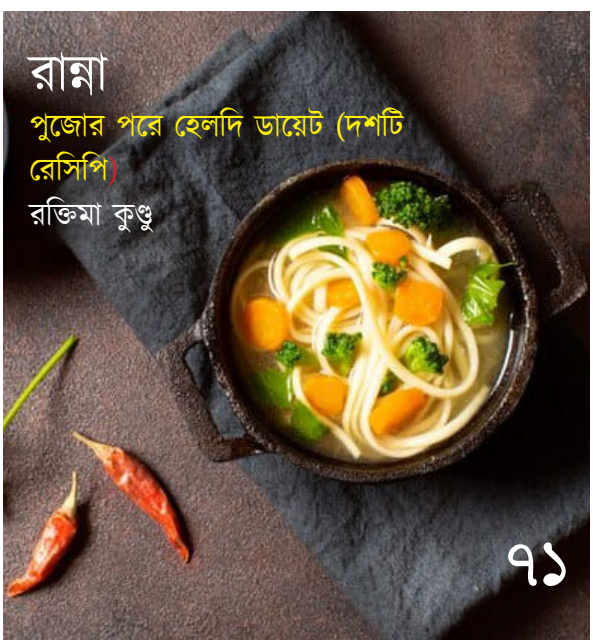

রান্না
পুজোর পরে হেলদি ডায়েট (দশটি রেসিপি)
রক্তিমা কুণ্ডু ৭১

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Trusted Since
1864

RIGHT CHOICE PRICE

Tyohaar Matlab

tbz®
The original since 1864

NO MAKING CHARGES*
on diamond jewellery

Free Gold Coin on
Diamond Jewellery purchase*

FLAT ₹ 499 Per GM*
Making Charges on
Gold Jewellery*

₹ 699 Per GM* Designer Gold Jewellery* & ₹ 899 Per GM* Studded Gold Jewellery*

GET 100%
value on exchange of any old gold bought from any jeweller*

Conditions Apply*

KOLKATA:

5, CAMAC STREET, NEAR THEATRE ROAD (033 40064905)
NEAR PANTALOONS, KANKURGACHI (033 40052214/15/16)

For franchise inquiry, please call on 9158635000 or send email on franchisee@tbzoriginal.com

tbz®
The original since 1864

ভূতচতুর্দশীর রাতে শেয়াল-শকুনের ডাকে তেনারা আসেন

কমলেন্দু সরকার

রাজারাপ্পা মন্দির

মলুটি গ্রাম

একটা সময় ছিল যখন 'হাওয়া' লেগে যাওয়ার ভয় থাকত। এখনও হয়তো প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে আছে 'হাওয়া' লেগে যাওয়ার ভয়। আশ্বিন পড়লেই বাড়ির বড়রা সর্বক্ষণ গায়ে জামা দেওয়ার কথা বলতেন। আর আশ্বিন কেটে কার্তিক পড়লেই কালীপুজোর দিন কয়েক আগে থেকে বাড়ির বড়রা বলতেন, "শ্মশানের ধারকাছ দিয়ে যাবি না, হাওয়া লাগবে।" এখনও গ্রামের বা মফসসলের ফাঁকা জায়গায় শ্মশান পেরোতে বেশ শিহরন লাগে! লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়, গা-ছমছম করে। যাইহোক, শ্মশানের 'হাওয়া' ব্যাপারটা ঠিক কী সেটা বুঝে উঠতে পারতাম না সেই ছেলেবেলায়! একটু বয়স বাড়তে বুঝেছিলাম 'হাওয়া' বস্তুটি কি। ভূতেদের তো কোনও অবয়ব নেই, তেনেরা 'হাওয়া' ব্যতীত অন্যকিছু নয়। বুঝলাম, 'হাওয়া' লাগার অর্থ ভূতে ধরা। ভূত ছাড়াতে প্রয়োজন জলপড়া ইত্যাদি। আর কালীপুজোর আগের রাতই ভূতচতুর্দশী। তাই ধরে নেওয়া হত দুর্গাপ্রতিমা জলে পড়লেই 'তেনাদের' আগমন।

আমাদের বাড়ির কাছেই একটা শ্মশান আছে। উত্তরে হাওয়ায় দাপিয়ে মড়া পোড়ার গন্ধ আসত বাড়িতে। এখনও আসে। তবে অতটা নয়। এখন তো বিজলির চুল্লিতে দাহ করার নিয়ম। যাইহোক, সেই চামড়া পোড়ার গন্ধ ছিল বীভৎস। এই গন্ধটা নাকি ভূতেরা খুব

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Graceful Festive Range

FROM

Mrignayani

HANDLOOM • HANDICRAFTS

20% DISCOUNT

mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com

M.P. GOVT. EMPORIUM

Mrignayani® | **Avanti**

Dakshinapan, Dhakuria Ph.: 24236715

Uttarapan, Uttadanga Ph.: 23550666

Video Call:
7439612704

ভালবাসে। তাই রাত্রিবেলা মড়া পোড়ার গন্ধ এলে ভাই-বোন সবাই গুটিসুটি মেরে থাকতাম বিছানায়। কালীপুজোর দু'দিন আগে থেকে 'হাওয়া লাগা' ব্যাপারটা ছিল তেনাদের উদ্দেশেই। কালীপুজোর আগের রাতটা হল ভূতচতুর্দশী। এইদিন তেনারা নামেন ধরায়। এই রাতটা কিন্তু বেশ গা-ছমছমে ছিল। শ্মশানও ছিল অন্ধকার। সামান্য আলো টিমটিম করে জ্বলত। শ্মশানকালী পুজো হলেও আলোর বাহুল্য ছিল না। ভূতচতুর্দশীর রাতে তেনাদের যাতায়াত বেশি হত বলে আলোর ব্যবস্থাও তেমন হত না। তাছাড়া শ্মশানকালীর প্রতিমা তৈরি থেকে পুজো, এমনকী বিসর্জন একদিনেই করতে হত। সম্ভবত এখনও একই নিয়ম বলবৎ।

সে ছিল বীভৎস রকম শিহরন জাগানো রাত। ওই পরিবেশ তৈরি হত সন্ধেবেলা থেকেই। যাঁরা পুজো করতেন তাঁরা সন্ধে থেকেই নেশা-ভাং করতেন। পুজো শুরু হত রাত গভীর হলে। যিনি পুজো করতেন তিনি লাল ধুতি আর উড়নি পরতেন। তাঁর ছিল জলদগম্ভীর কণ্ঠ। যখন মন্ত্রোচ্চারণ করতেন চারিদিক গমগম করত। ওই মন্ত্রোচ্চারণের মাঝেই হত দাহকার্য। সেই পুরোহিত ছিলেন এক তান্ত্রিক। মন্ত্রপাঠের মাঝেই হোমে ঘি ফেললেন বা ধুনো। শব্দ করে দপ করে হোমের লেলিহান শিখা আলোকিত করে তুলত! পাশাপাশি চিতার কাঠ ফটাস ফটাস

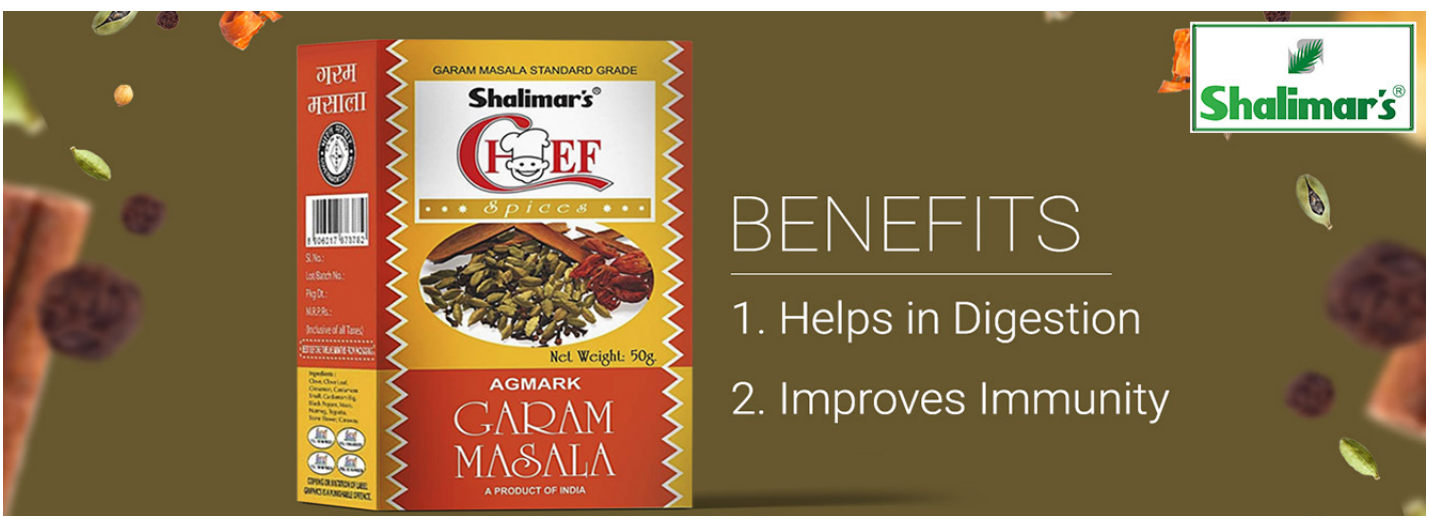

শ্মশানকালী পুজোর

শব্দে ফাটে। সবমিলিয়ে এক ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করত শ্মশান জুড়ে। শুধু যে শ্মশানেই ভৌতিক কিংবা গা-ছমছমে শিহরন জাগানো পরিবেশ তৈরি হত এমন নয়, তার বাইরেও হত। তা দেখেছি একাধিকবার, একাধিক জায়গায়।

বছর চল্লিশেক আগে আটের দশকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এক কালীপুজোর দিন আমরা কয়েক বন্ধু পৌঁছেছিলাম রাজারাপ্পা। সেখানে রয়েছে মা ছিন্নমস্তার থান। দিনের বেলাটি অত্যন্ত চমৎকার। অপূর্ব এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! বিশেষ করে, দামোদর আর ভৈরবী নদী পরস্পর যেখানে মিলছে। দামোদর হল পুরুষ, ভৈরবী নারী। তাই ভৈরবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দামোদর। সূর্য পাটে যাওয়ার পর থেকেই রং বদলাতে থাকে, পাল্টাতে থাকে পরিবেশ! মনে হয়, জঙ্গলের ভিতর থেকে এই বুঝি কেউ এসে জাপটে ধরবে। তেনাদের কেউ হয়তো এসে বলবে 'আঁমাদের জাঁয়গায় তোঁরা ভাগঁ বঁসাতে এঁসেছিস কেঁন?' না, তেমন কাউকে নাকি সুরে কথা বলতে শুনিনি বা তেনাদের কেউ দেখা করতেও আসেননি।

এখন জানি না কেমন হয়েছে রাজারাপ্পা। সেইসময় কিন্তু বেশ ভয়ংকর নিরিবিলি ছিল রাজারাপ্পা! রাতের খাওয়া সেরে মন্দির চত্বরে এলাম। তখনও শুরু হয়নি পুজোপাঠ। রাত বারোটা নাগাদ রাজপুরুষ

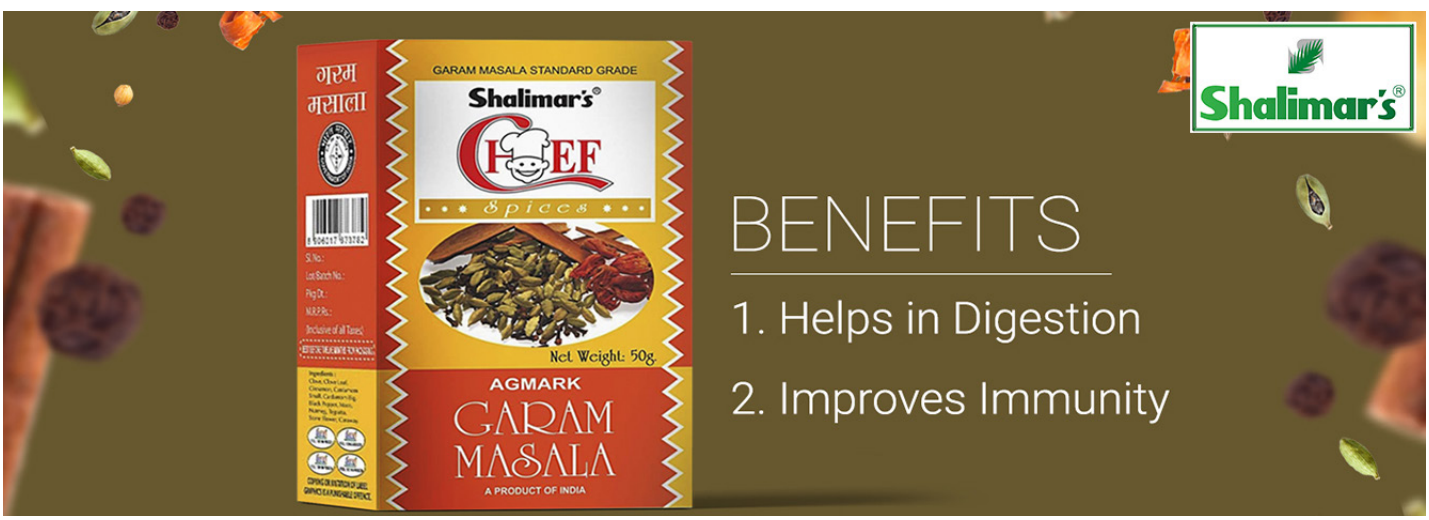

শ্মশানে কাঠের চিতায় দাহ করা হচ্ছে

চেহারার পূজারি ঢুকলেন। তাঁর পরনে লাল ধুতি, লাল চাদর। হাতে পেল্লাই এক খাঁড়া। দেখলেই ভিরমি খেতে হয়! সেটি ছিল বলির খাঁড়া। প্রথমে তিনি পুজো শুরু করলেন। ওইরকম ভারী কণ্ঠস্বর তার আগে শুনিনি। এখনও যে শুনেছি, তেমন নয়। তাঁর মন্ত্রোচ্চারণ পাহাড়, জঙ্গল বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ছে ছিন্নমস্তা মায়ের থান ছাড়িয়ে দূর, বহুদূরে। ওই মন্ত্র নাকি যতদূর শোনা যাবে ততদূর নাকি তেনাদের দেখা মিলবে না। কিংবা অশুভ আত্মা উপস্থিতও হবে না। ওইরাতে উপস্থিত এক ভক্ত বলেছিলেন এসব কথা। সাহস পেয়েছিলাম তাঁর কথায়। কেননা রাত যত বাড়ে, ভয় তত বাড়ে। অমন ভয়োৎপাদক রাত্রি খুব কম পেয়েছিলাম রাজারাপ্পার আগে। পুজোর পর শুরু হল বলি। পর পর এক এক করে বলি দিচ্ছিলেন তিনি। স্থানীয়দের কাছে শুনেছিলাম, আগে নাকি জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে মা ছিন্নমস্তার থানে আসত বলির রক্ত খেতে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, মা ছিন্নমস্তা আসতেন বাঘিনী রূপে।

এর আগে দেখা কালীপুজোর এক ভয়ংকর রাত দেখেছিলাম বঙ্গের কোনও এক স্থানে। নামটি প্রকাশে মানা ছিল। তাই আর নামটি মুখে নিলাম না। সে ছিল শ্মশানকালী পুজোর রাত। জায়গাটিতে কীভাবে পৌঁছেছিলাম সেসব আর স্মরণে নেই। ঘটনাটি পঞ্চাশ বছর কিংবা তারও পূর্বের। সেই গ্রামে গেছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি। তার বাড়িতে ছিলামও কিছুদিন। দুর্গাপুজো কাটিয়ে। ঠিক কালীপুজোর কয়েকদিন আগে। কালীপুজোর দিন সকালে আমার বন্ধুটি নিয়ে গেছিল এক রাতের জন্য এক শ্মশান কালীর পুজোয়। বন্ধুটির বাড়ি থেকে অনেকটাই দূরে সেই পুজোর স্থান। গেছিলাম দু'চাকার গাড়িতে। যতদূর মনে আছে, জায়গাটি ছিল কোনও এক নদীর ধারে। নদীটির চমৎকার একটি নাম ছিল। বর্তমানে স্মরণে নেই। নদীর চরে গ্রামের লোকেরা দাহকর্ম সারত। মোদ্দা কথা সেটি ছিল শ্মশান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব! অপার শান্তি বিরাজমান। বেশি নিরিবিলি, শান্ত জায়গা আবার কোনও কোনও সময় ভয়ংকর লাগে! তাই লেগেছিল। মাইলখানেকের ভিতর কোনও গ্রাম ছিল না। কিন্তু সেই শ্মশানে হত কালীপুজো। সেখানে বাস ছিল এক তান্ত্রিকের। তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন। তিনিই পুজো করতেন। দূর গ্রামের লোকেরা যাঁরা শ্মশানটি ব্যবহার করতেন তাঁরাই পুজোর জোগাড়যন্তর করতেন। কালীপুজোর দিন কিছু লোকজনের মুখ দেখা যেত।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ADI READYMADE CENTRE PVT. LTD.

Bondings are forever

Beautiful Beginnings
WITH EXQUISITE

Lehengas

EXCLUSIVE
WEDDING
COLLECTIONS

STATION ROAD, SODEPUR
PH: 2583 6149/2523 5588

FOR ONLINE SHOPPING CALL US AT:
9830117563 | 7003384398

VISIT US AT: www.adireadymadecentre.net | FOLLOW US ON

দিনের বেলাতেও ছিল আলোছায়াময় রহস্যমাখা, গা-ছমছমে জায়গা। ছিল ছোট্ট এক শ্মশানকালী মায়ের অস্থায়ী মন্দির। কেননা, বর্ষার সময় সব ভাসিয়ে দিত নদী। শিবের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন মা। ভয়ংকর রূপ মায়ের। লাল টকটকে জিভ। আলুলায়িত কেশরাজি। মা শ্মশানকালী। শুনেছিলাম মা খুব জাগ্রতা। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তবুও ভক্তেরা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য খুববেশি যে আনাগোনা করতেন, তা কিন্তু নয়। অনেকেই বলেছিলেন, রাত্রিবেলা মন্দির থেকে নূপুরের ছমছম আওয়াজ আসে। চিতায় জ্বলন্ত শবদেহের চামড়া পোড়ার গন্ধ আর ধূপধুনোর গন্ধ মিশে গেছিল ওই কালীপুজোর রাতে। সঙ্গে তান্ত্রিকের পুজোর মন্ত্র ভয়ংকর করে তুলেছিল শ্মশানের রাত্রিবেলা! কাছেপিঠে প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক গা-শিউরে দিয়ে ভেসে আসছিল। সবচেয়ে ভীতিকর ছিল শকুনের ডাক। কেউ কেউ বলেছিল শকুনের কান্না। ছিল এক ভয়াবহ রাত। আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে পুজোর সময়। বাতাসে ছিল হিম স্পর্শ। মন্দিরের ভিতরটা ছিল বেশ আরামদায়ক হলেও ভিতরে দু'একজন ছাড়া দাঁড়াবারও জায়গা ছিল না। হঠাৎ পরিবেশ হয়ে ওঠে গুমোট এবং অস্বস্তিকর! প্রদীপ গেল নিভে! অথচ হাওয়া ছিল না। ভিতরে কারওর কারওর উপস্থিতি যেন টের পাওয়া গেল! পূজারি হঠাৎ মন্ত্রপাঠ থামিয়ে বললেন, "আপনারা কেউ এখন নড়াচড়া করবেন না। ভয় পেয়ে মন্দির-চৌহদ্দির বাইরে যাবেন না। বিপদ হতে পারে।" তারপর কাউকে বা কাদের উদ্দেশে বললেন, "যা, এখান থেকে বেরো। এর চৌহদ্দির মধ্যে থাকবি না," বলে নিচু হয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে লাইন কেটে দিলেন।

আমরা দু'জনই ছিলাম বহিরাগত। বাকি জনা চার-পাঁচেক স্থানীয়। মনে হল, তাঁরা এসব ব্যাপার জানেন। বাকি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলেন সন্ধে নামার আগেই। যাইহোক, মন্দিরের ভিতরের পরিবেশ আবার স্বাভাবিক। সেই গুমোটভাবও আর ছিল না আশপাশে! প্রদীপও আর নেভেনি! মন্দিরের পাশেই থাকতেন সেই তান্ত্রিক পূজারি। কোনওরকমে রাত কাটিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম সকাল হতেই। পুরনো কালে এমনসব জায়গায় হত নরবলির খবর পাওয়া যেত! ডাকাতে কালী সেইসময় বাংলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে ছিল। বাংলার ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে নরবলি দিত। কালীপুজোর নিশুতিরাতে তারা বেরোতো ডাকাতি করতে। তার আগে মায়ের পুজো করে দিত নরবলি।

নরবলি হত খোদ কলকাতার বুকেও। তখন কলকাতা ছিল জলা-জঙ্গলে ভরা। বাঘ বেরোতো গিরিশ পার্ক, শোভাবাজার অঞ্চলে। ধর্মতলাতেও বাঘ ঘুরে বেড়াত। সে কথা ভিন্ন। চিৎপুরে ছিল চিতে ডাকাতের বাস। ডাকাতি করতে বেরোবার আগে কালীপুজো করে, নরবলি দিত। দিনের বেলাতেও ডাকাতি, রাহাজানি হত চিৎপুর রোডে। এই রাস্তাটাই ছিল কালীঘাট যাওয়ার একমাত্র পথ। তাই দলবেঁধে দর্শনার্থীরা যেতেন কালীঘাট। চিতু ডাকাতের দল তাঁদের পিছন থেকে পাবড়া ছুড়ে লুটপাট করত। রাতে ডাকাতিতে বেরোতো। তার আগে নিয়মমতো কালীপুজো করত। নরবলি দিত। চিতু ডাকাত যখন 'হা রে রে রে, হা রে রে' গগন ফাটানো চিৎকারে দিতে দিতে বেরোতো তখন এলাকার বাসিন্দাদের হাড় হিম হয়ে যেত। উত্তর কলকাতায় শুধু চিতু ডাকাত নয়, বহু ডাকাতই থাকত। তাদের বাস ছিল গঙ্গার ধারে হোগলার কিংবা গভীর জঙ্গলে।

নরবলি হত দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এলাকা গড়িয়াহাটের কাছে পূর্ণদাস রোডে। দেড়শো-দু'শো বছর আগে এই এলাকা জুড়ে ছিল জঙ্গল। সেই জঙ্গলে থাকত মনোহর বাগদি নামে এক ভয়ংকর ডাকাত। সে কালীপুজো করে ডাকাতিতে বেরোতো। কাজে সফল হলে নরবলি দিত মায়ের সামনে। তবে সে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে পুকুরও কাটে এলাকায়। শোনা যায়, মনোহর পুকুর রোড রাস্তার নামকরণ হয় তারই নামে। ডাকাত মনোহর বাগদির পূজিত কালী আজও বর্তমান। ছোট্ট একটি মূর্তি। তাই অনেকেই বলেন-- ছানা কালী।

তিনশো বছর আগে খিদিরপুরের সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড এলাকা ছিল জলা-জঙ্গলে ভরা। ছিল শ্মশানভূমি। সেই শ্মশানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সোনাই কালী। প্রতিষ্ঠিতা রঘু ডাকাতের দাদা গোলকনাথ চক্রবর্তী।

মা সোনাই কালী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এক কার্তিক অমাবস্যায় কালীপুজোর দিন। শোনা যায়, ডাকাতি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করতে যাওয়ার আগে রঘু ডাকাত মায়ের পুজো করত। নরবলি দিত।

অমাবস্যার রাত মানেই ভীতিকর। প্রতি অমাবস্যায় মা কালীর থানে বিশেষ পুজো হয়ে থাকে। কার্তিক অমাবস্যায় কালীপুজোর রাতে সর্বত্রই বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা থাকে। পুজো হয় গভীর রাতে। ডাকাতে কালী এবং শ্মশান কালীর পুজো ছিল ভয়ংকর। সাধারণ মানুষের ছিল সেসব স্থানে প্রবেশ নিষেধ।

একটা সময় ছিল সাধারণ মানুষ তারাপীঠ মহাশ্মশানে ঢুকতে ভয় পেতেন। গভীর অরণ্যে ঢুকতে গা ছমছম করত। শোনা যায়, বহু মানুষ দাহ করতে এসে শবদেহ ফেলে রেখে পালাতেন। শবসাধনা করতেন তান্ত্রিকেরা। হোমযজ্ঞ হত শ্মশানে। এখনও তারাপীঠ মহাশ্মশানে কালীপুজোর রাতে হোমযজ্ঞ হয়। মহাশ্মশানের নিশছিদ্র অন্ধকারে যখন যজ্ঞের লাল লেলিহান শিখা মিলিয়ে যায় তখন মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়। শিহরন জাগে। না, অলৌকিক কিছু চোখে পড়েনি। তবে অন্ধকার থেকে যখন তান্ত্রিকদের কণ্ঠস্বর ভেসে তখন চমকে যেতে হয় আপন-খেয়ালেই। এমনই এক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল একবার। কার্তিক অমাবস্যার রাত। শুরু হয়েছে পুজোর তোড়জোড়। মহাশ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি বন্ধুরা। হঠাৎই অন্ধকার কুটির থেকে কেউ যেন ডেকে উঠল, "বাবা কমল এদিকে আয়, শুনে যা।" দেখলাম কালো পোশাক পরিহিত এক তান্ত্রিক। আমাকে ডাকছেন। তাঁর তো আমার নাম জানার কথা নয়! বিস্মিত হলাম! হওয়ারই কথা।

তা গেলাম। আমার বন্ধুরা এগিয়ে গেছে। একেবারেই যে বুক ঢিপঢিপ করছিল না, তা নয়। কিছুটা বুক দুরুদুরু অবস্থায় তাঁর কুটিরে প্রবেশ করলাম। আমার নাম কি করে জেনেছিলেন সেই রহস্য ফাঁস করলেন তিনি। তবে অনেক কথা বলেছিলেন সেগুলো মিলেছিল। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের কথা।

না, তিনি কোনও অর্থ দাবি করেননি। সেইসময় ধূমপানের অভ্যাস ছিল, তাঁকে গোটাকয়েক সিগারেট দিতেই ভীষণ খুশি। কিছুক্ষণ তাঁর কুটিরে কাটিয়ে বেরিয়ে আসি। পরে সেই তান্ত্রিকের খোঁজ করি কিন্তু পাইনি। এমনকী তাঁর কুটিরটিও! কালীপুজোর রাতে তারাপীঠ মহাশ্মশানের ঘটনা আজও মনে পড়লে বিস্মিত হই! এছাড়া আর কোনও অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হইনি। তবে অমাবস্যার রাতে বড়ই মোহময়, শিহরিত করে তারাপীঠের মহাশ্মশান।

তারাপীঠ থেকে কিছুটা দূরে মলুটি। সেখানে রয়েছেন বামাখ্যাপার ছোট মা মৌলিক্ষা দেবী। মলুটি হল টেরাকোটার গ্রাম। বহু টেরাকোটা মন্দির আছে এখানে। এখানকার কালীপুজো বিখ্যাত। শোনা যায়, এখানে দিনের দিনে প্রতিমা বানিয়ে পুজো করা হয়। মলুটির কালীপুজোর রাতটিও বেশ শিহরিত করেছিল। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতের অন্ধকার যেমন ভয়ংকর লাগে তেমনই সম্ভ্রম জাগায়। মলুটির

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কালীপুজোর রাতে তেমনই অনুভব করেছিলাম। এই গ্রামের কালীপুজো দেখার মতো। সারারাত ধরে কালীপুজো হয় মলুটিতে। পুজোর আগে মা মৌলিক্ষা দেবীর কাছে অনুমতি নিতে হয়। এই গ্রামের প্রধান উৎসব কালীপুজো। প্রবাসীরা সবাই ফেরেন গ্রামে। এখানকার কালীপুজোকে বলা হয় গ্রামের মানুষের মিলনোৎসব। মলুটির পুরনো দিনের কথা পাওয়া যায় কালকূট-এর 'কোথায় পাব তারে' বইয়ে। সেসব পাঠ করলে গায় কাঁটা দেয়! মলুটি গ্রামের কালীপুজোর রাতে উপস্থিত থাকা সারা জীবনের এক অভিজ্ঞতা! শ্মশানকালী পুজোয় সর্বত্রই বিরাজ করে ভয়ংকর এক শিহরন! শ্মশানকালীর পুজোর রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম। গ্রামবাংলা, মফসসলে এমনকী শহরের একাধিক শ্মশান রয়েছে, যেখানে শবদেহ না এলে পুজো শুরু হয় না। মরদেহর জন্য অপেক্ষা চলে। দক্ষিণ শবদেহ আসবে তারপর শুরু হবে শ্মশানকালী পুজো। একদিকে চলবে দাহকর্ম আর অন্যদিকে চলবে শ্মশানকালীর পুজো। জলদগম্ভীর কণ্ঠে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ আর অন্যদিকে চিতাকাঠ ফাটার শব্দ, দুই মিলিয়ে ভয়ংকর ছমছমে এক পরিবেশ তৈরি হতে দেখেছি শ্মশানে। আবার অনেক শ্মশানে দেখা যায়, শ্মশানকালীর পুজো নির্দিষ্ট সময়ে শুরুর জন্য একটি মৃতদেহ দাহ করার জন্য পূর্বেই আনা হয় কিংবা বাড়ির লোকেদের অনুরোধ পুজোর জন্য অপেক্ষা করার কথা। এমনকী, কোনও কোনও শ্মশানে শ্মশানকালী পূজিত হন বৈষ্ণবমতে। কোনওরকম বলি নিষিদ্ধ হলেও, মায়ের ভোগ নিবেদনের জন্য অপেক্ষা করা হয় শবদেহের। অর্থাৎ শ্মশানে শবদেহ না-এলে দেবীর ভোগ নিবেদন হবে না। শোনা যায়, কার্তিক অমাবস্যা হল সবচেয়ে অন্ধকার রাত্রি। সেইকারণে তন্ত্রসাধনার জন্য এইদিনটিকেই বেছে নেন তান্ত্রিকেরা। শবদেহের ওপর বসে তন্ত্রসাধনা শুরু করেন।

সবশেষে একটি শ্মশানকালীর প্রসঙ্গে আসি। গ্রামটির নাম একমুহূর্তে স্মরণে আসছে না বা নেই। তবে গ্রামটি বর্ধমান জেলার কোনও একটি জায়গায়। বহু পুরনো গ্রাম। ততোধিক পুরনো সেখানকার শ্মশানকালী। কিন্তু মায়ের কোনও মন্দির নেই। নেই মানে পাকা ইমারত নেই। মাথাতেও কোনও ছাদ নেই। স্থানীয়দের কাছে শুনেছিলাম, মা খোলামেলা জায়গায় থাকতে পছন্দ করেন। এমনকী, মাথার ওপর ছাদ তো একেবারেই অপছন্দের। কোনও এক কারণে গ্রাম ছেড়ে মানুষজন চলে গেলেও দেবী যেতে চাননি। তিনি একাই রয়ে যান গ্রামে। এলাকাটি ভরে গাছগাছালিতে। জঙ্গলের ভিতরই বাস ছিল দেবীর। পূর্বে শ্মশানকালী মায়ের পুজো হত পাতার আচ্ছাদনে। পরে একটি টিনের কাঠামো মতো হয় মায়ের জন্য।

সাধারণত মানুষজন এখানে আসতে ভয় পান। কেমন একটা শিহরন জাগানো পরিবেশ আশপাশে। তবে প্রতি অমাবস্যায় দলবেঁধে গ্রামের কিছু মানুষ আসেন মায়ের পুজো দিতে। আর কার্তিক অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পুজো শুরু রাত ১২টার পর। স্থানীয়জনেদের কাছে শোনা, মায়ের পুজোর সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়, যা অবর্ণনীয়! আসলে, কার্তিক অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পুজোয় উপস্থিত থেকে পুজোয় অংশগ্রহণ জীবনের এক অন্য অভিজ্ঞতা।

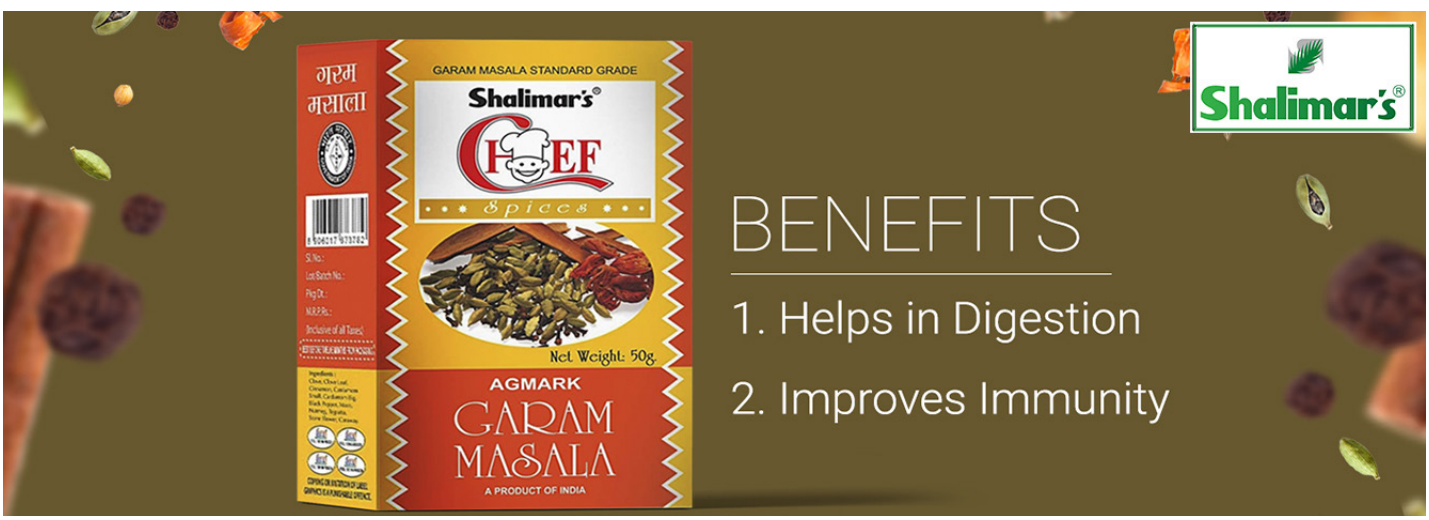

কাপালিক ঠাকুরদা, বটুক ভৈরব

শোভনলাল আধারকার

সে বহুকাল আগের কথা, কিন্তু সেই চেহারাটা মনে এলে আজও রাতের বেলায় গায়ে কাঁটা দেয় এমনই ভয়ানক ছিল সেই চেহারাটা। আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। শুনলাম, আমার খুড়শ্বশুররা নাকি বিশাল ধনী লোক আর ওদের বাড়িতে প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ শনিবারে খুব ধুমধাম করে শ্মশানকালীর পুজো হয়। গৃহিণীও যাওয়ার বায়না ধরলেন: খুড়োমশায় বিশেষ করে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, আর বিয়ের পরেই এই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS

Bhaskar Sriniketan

STORE ▸ BEHALA

+(91)-89103 75304/89103 86709 www.bhaskarsriniketan.com bhaskarsriniketanbehala

পুজো, তাই না গেলে দেবী-মা অসন্তুষ্ট হতে পারেন ইত্যাদি। অগত্যা অফিসে ছুটি বাড়াতে হল।

পুজোর দিন সকালেই আমরা শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয়ে গেলাম। বাড়ির প্রথম জামাইয়ের আপ্যায়নটা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশিই হয়। তাছাড়া এই নাকি প্রথম 'শহুরে' জামাই।

নিয়ম অনুসারে গ্রামের কোনও বাড়িতে সেদিন রান্নার উনুন জ্বলবে না। সারাদিনের খাওয়াদাওয়া পুজোবাড়িতেই হবে। পুজো শেষ হতে অনেক রাত হবে তাই সন্ধ্যাবেলাতেই সকলকে একপ্রস্থ 'টিফিন' করিয়ে দেওয়া হল। সেই টিফিনই এত ভারী যে আমার মতো শহুরেদের রাতে আর কিছু খাওয়ার কোনও উপায়ই থাকবে না। অতএব সন্ধ্যার পরেই যেতে হল। নাটমন্দিরের পাশেই বিরাট বসার ঘর, সেখানে বসেছে আত্মীয়পরিজন, পাড়াপড়শি, জ্ঞাতি-

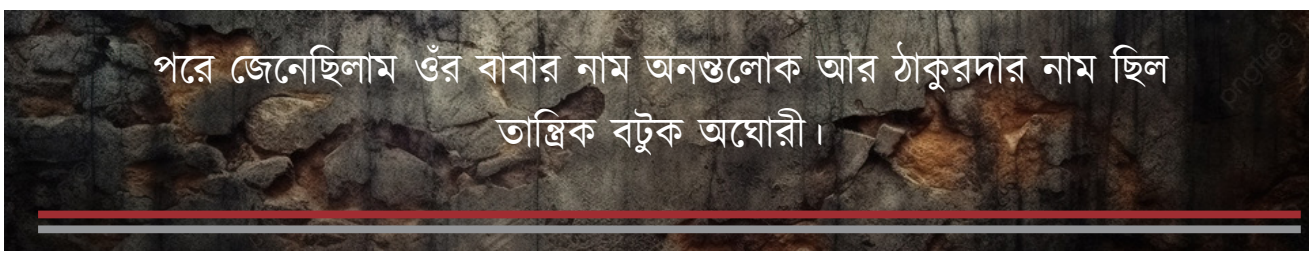

গুষ্ঠি আর ওদের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি পরিবার।

একটু পরে পুরোহিত মশায় এলেন। বিশাল লম্বা-চওড়া চেহারা, রক্ত-রাঙা লাল ধুতির উপর হাফ-হাতা লাল টকটকে ফতুয়া পরা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা-চওড়া মানুষটির মাথার লম্বা চুল জটার আকারে তালুর উপরে গিঁট লাগানো। কপালে বড় লাল চন্দনের তিলক। দাঁড়িতে মুখের অধিকাংশই ঢাকা, কিন্তু অসাধারণ উজ্জ্বল চোখ দুটি রাতের আকাশে তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল। ওঁকে পুরোহিতের চেয়ে কাপালিক বলে বেশি মনে হচ্ছিল। নামটাও সেইরকম ভয়াল: পণ্ডিত আদিদেব অনন্তবটুক শাস্ত্রী। পরে জেনেছিলাম ওঁর বাবার নাম অনন্তলোক আর ঠাকুরদার নাম ছিল তান্ত্রিক বটুক অঘোরী। উপস্থিত সবাই পড়িমরি করে দৌড়ল তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে আর হাত দেখিয়ে ভবিষ্যৎ জানতে। শহুরে 'নাস্তিক' আমি বসে মজা দেখছিলাম কিন্তু ওই দশাসই চেহারার মানুষটিকে দেখে ভেতরে ভেতরে কিছু আতঙ্কিতও হচ্ছিলাম। হঠাৎ গৃহিণী আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ওঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বাধ্য হয়ে হেঁট মাথায় প্রণাম করতে গিয়ে মনে হল যেন কলকাতার মনুমেন্টকে প্রণাম করছি। কি আশীর্বাদ করলেন জানি না কিন্তু খপ করে আমার হাতের তালুটা দেখে মেঘগর্জনের স্বরে বলে উঠলেন, "অনেক উপরে যাবে ছোকরা, আর অনেকদিন দাপটে বেড়াবে ভব সংসার।

আমি হেসে চুপ করে শুনছিলাম কিন্তু গৃহিণী খুশি মুখে ভেতরে চলে গেলেন। এবার দলবেঁধে সবাই এগিয়ে এসে হাত বাড়াল-- সবাই ভবিষ্যৎ জানতে চায়। সকলকেই কিছু না কিছু বলে সন্তুষ্ট করে ঠাকুরমশায় বসে পড়লেন আমারই পাশে। ওঁর বিশাল চেহারায় আমি প্রায় ঢাকা পড়ে গেলাম।

নতুন জামাইকে যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা জামাইয়ের পরিবর্তে 'কাপালিক' ঠাকুরকে প্রণাম করে বেশি সন্তুষ্ট হলেন। শুনলাম ওঁর বাবা নাকি খুব নামী জ্যোতিষী কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার কারণে বাড়ির বাইরে কোথায়ও বেরিয়ে পুরুতগিরি বা জ্যোতিষচর্চা করেন না; নাম যদিও অনন্ত বিক্রম শাস্ত্রী কিন্তু উনি 'ল্যাংড়া-ঠাকুর' নামেই বিশেষ পরিচিত।

আমরা সবাই বসেছিলাম কিন্তু পুরোহিতমশায় একটু পরে হঠাৎ উঠে পড়ে মেঘগর্জনের স্বরে বললেন, "ওরে বাবা কার্তিকপূজার তো অনেক দেরি আমি ততক্ষণ মায়ের জপতপ সেরে আসি তাহলে।"

বাড়ির কর্তা খুড়োমশায় করজোড়ে দৌড়ে এসে বললেন, "ঠিক আছে বাবাঠাকুর, আপনি আসুন ততক্ষণে মেয়েরা সবকিছু গুছিয়ে রাখবে;"

খুড়োমশায় আর একবার ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

২

রাত দশটার কিছু আগে ভীমকান্ত পুরুতমশায় প্রায় টলতে টলতে ফিরে এলেন। তাঁর চোখ দুটো তখন জবাফুলের মতো টকটকে লাল, আর নেশায় ঢুলু ঢুলু; সে দৃশ্যে মার কোলে বসে থাকা কয়েকটা বাচ্চা ভয়ে কেঁদে উঠল। ওঁর শরীর থেকে কড়া গাঁজার গন্ধ আসছিল। দুটো-একটা কথাই বলছিলেন তাও জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমার পাশে-বসা এক স্থানীয় বয়স্ক জামাই আমাকে ইশারায় জানালেন যে জবরদস্ত কলকের 'সেবা' করে এসেছেন। আমি হেসে ফিসফিসিয়ে বললাম, "ওই ডোজটা না নিলে চলবে কি করে?"
কিন্তু লক্ষ করলুম পূজায় বসার পর তিনি একেবারে অন্য মানুষ; প্রতিটি মন্ত্রের এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ আর বাচনশৈলী আমি আগে কখনও শুনিনি। মনে হল, মন্ত্রগুলি যেন বিশাল শরীরের ভিতর থেকে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ মানুষটির উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল: ইনি তো সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত পুরোহিত নন।
পুজো শেষ হতে হতে মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেল। পুজোর শেষে পুষ্পাঞ্জলি আর হোম হতে হতে রাত আর বেশি বাকি রইল না। পুরোহিতমশাই আরতি করছিলেন- দেখলাম ওর সারা শরীর ঘামে ভিজে ফতুয়াটার রং বদলে গেছে। পূজা শেষ করে গামছায় মাথা, ঘাড় আর দুহাত মুছতে মুছতে ভয়াল-দর্শন মা শ্মশানকালীর প্রতিমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে টেবিল ফ্যানটার পাশে গিয়ে বসলেন। ওদিকে ঠাকুরদালানের বাইরে খাবার টেবিল-চেয়ার পড়ে গেছে। উপস্থিত সবাই গিয়ে সেখানে বসে পড়েছে: প্রসাদ আর খিচুড়ি ভোগ ওখানেই পাওয়া যাবে। আমার গৃহিণী এসে জানালেন আমাকে জনতার ভিড়ে বসতে হবে না আমার খাবার এখানেই দিয়ে যাবে। আমি ইশারায় জানালাম পেটে জায়গা নেই আর কিছু খাব না।
গৃহিণী বিরক্তি প্রকাশ করে, "যা খুশী করো," বলে চলে গেলেন।
ময়দান খালি, আমি এবার সুযোগ বুঝে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম পুরোহিতমশায়ের কাছে।
আমি কাছে পৌঁছতেই উনি স্মিত হেসে ফিরে তাকালেন। ভীমকান্ত স্বরে বলে উঠলেন, "জামাইবাবার মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছে মনে হয়।" বুঝলাম মুখের দৃষ্টি অনুসরণ করে মনের কথা পড়ে নেওয়ার মানসিক ক্ষমতা ওঁর আয়ত্তে।
আমি হাত জোড় করে বললাম, "অপরাধ নেবেন না; আমি মনে প্রশ্ন চেপে রাখতে পারি না।"
"তা তো বুঝতেই পারছি। বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করো," সামান্য হেসে পণ্ডিত আদিদেব শাস্ত্রী বললেন, "এই মূর্খ ব্রাহ্মণ সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।"

"জামাইবাবার মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছে মনে হয়।" বুঝলাম মুখের দৃষ্টি অনুসরণ করে মনের কথা পড়ে নেওয়ার মানসিক ক্ষমতা ওঁর আয়ত্তে।

আমি জিভ কেটে কানে হাত ছুঁইয়ে বললাম, "ঠাকুরমশাই, আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি অপরাধ নেবেন না, মূর্খ আপনি নন, মূর্খ আমরা যারা পড়াশুনো না করে, না জেনে সবকিছু বিচার করার স্পর্ধা করি।"
গৌর মুখমণ্ডলে বজ্র-মেঘে বিদ্যুতের মতো একচিলতে হাসি খেলে গেল। আর একবার গামছায় মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছে নিলেন।
ভণিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কখনও কি কোনও কাপালিকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?"
"কেন আমার চেহারাটা সেইরকম বলে?" স্মিত হাসলেন পণ্ডিত আদিদেব শাস্ত্রী। কিন্তু হাসির আড়ালে যে উনি একটু চমকে উঠে ক্ষণিক আনমনা হয়ে গেলেন, সেটা আমার চোখ এড়ালো না। চোখবুজে কয়েক মিনিটের জন্য যেন ধ্যানস্থ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট ওই অবস্থায় থাকার পর চোখ খুলে বলতে আরম্ভ করলেন, "আমার ঠাকুরদামশাই ছিলেন জাত কাপালিক-অঘোরী তান্ত্রিক, নাম বটুক ভৈরব; পূর্বাশ্রমে নাম ছিল বটকৃষ্ণ শাস্ত্রী; তান্ত্রিক হওয়ার পর নাম হয়ে গেল অঘোরী বাবা বটুক ভৈরব"; শুনে আমি চমকে উঠে ওঁর আপাদমস্তক আর একবার জরিপ করলাম: 'ঠাকুরদার চেহারাই পেয়েছেন,' মনে মনে ভাবলাম।

৩

তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "এই রসুলপুরের নদীর কিনারেই ছিল ওঁর আখড়া। মা'র কাছে শুনেছি, আমার বাবার জন্মের কয়েক মাস আগে নাকি উনি ঘর ছেড়েছিলেন এক কাপালিকের সঙ্গে। আমার বাবাকে নাকি ওঁর পাঁচ বছর বয়সে ছেলেধরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিলেন আট-ন' বছর পরে। বাবা ফিরে আসার কয়েক মাস পরেই নাকি সাপের কামড়ে ঠাকুরমা মারা যান। জানতে পেরে কাপালিক ঠাকুরদা বাড়িতে এসে মন্ত্রের জোরে সেই বিশাল আর ভয়াল গোখরো সাপটাকে উঠোনে টেনে আনেন। গোখরো রাগে ভয়ানক হিস হিস শব্দ করে মাটিতে ছোবল মারতে মারতে এগিয়ে আসে ঠাকুরদার দিকে। গোখরো যেই ছোবল মারতে ফণা তুলল ঠাকুরদা হাত দিয়ে মাথাটা টিপে ধরে পা দিয়ে তার ল্যাজ চেপে সাপটাকে টেনে তিনগুণ লম্বা করে দড়ির মত উঠোনে ছুড়ে দিয়েছিলেন। মন্ত্রের জোরে ঠাকুরমাও নাকি কিছুক্ষণের জন্য বেঁচে উঠেছিলেন কিন্তু ঠাকুরদা বিদায় নেওয়ার পরে সেই রাতেই আমার ঠাকুরমা মারা যান।" এতটা বলে ঠাকুরমশায় একটু চুপ করলেন। পাশে রাখা কাঁসার ঘটি থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে গামছায় মুখ মুছলেন। কয়েক টুকরো প্রসাদী ফল মুখে ছুড়ে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "নদীর চরেই ছিল আমার ঠাকুরদার আখড়া আর শ্মশানকালীর মন্দিরের হাড়িকাট। কোটালের জোয়ারের সময় সেই আখড়া প্রতিবার ভেসে যেত। আসলে ওটা ছিল গাছ আর লতাপাতার জঙ্গলে ভরা ছোট্ট একটা দ্বীপ। মানুষ বলতে ওই দ্বীপে একমাত্র ওই অঘোরীবাবা; যেতে হত হাঁটুর উপর পর্যন্ত জল পেরিয়ে। আমার বাবা বলেন জোয়ারে যখন কোনও সদ্য মরা ভেসে আসত তখন ঠাকুরদা মশায় সেই মড়া আখড়ায় টেনে এনে তার উপরে বসে সাধনা করতেন।"

মানুষ বলতে ওই দ্বীপে একমাত্র ওই অঘোরীবাবা; যেতে হত হাঁটুর উপর পর্যন্ত জল পেরিয়ে।

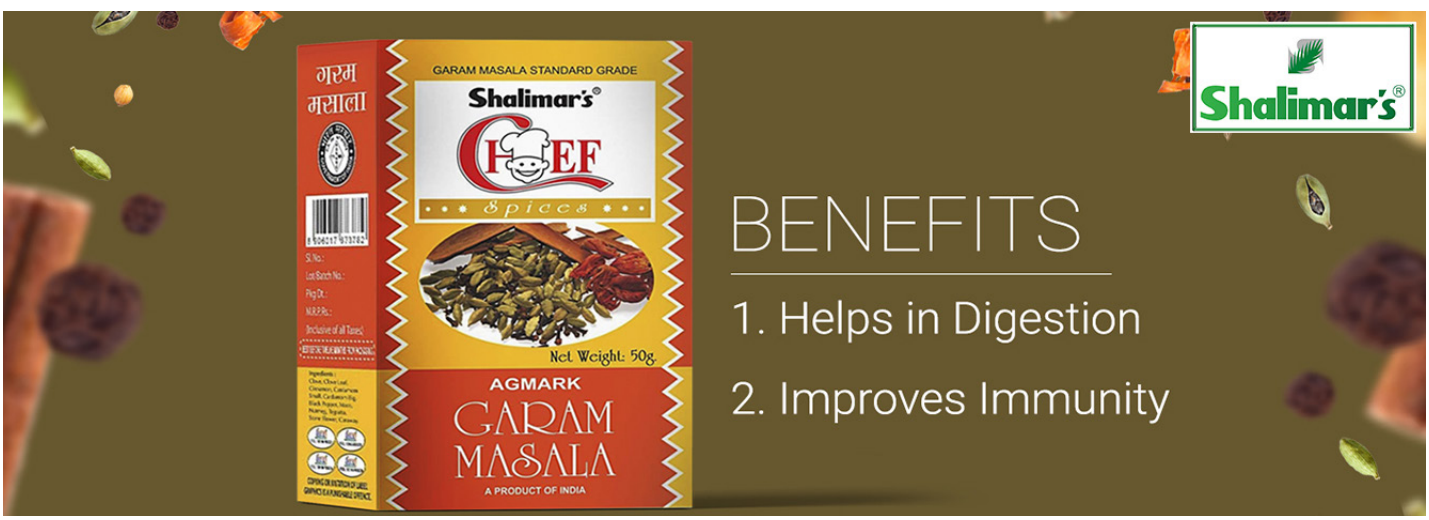

PIONEER IN BENGAL COTTON HANDLOOM SAREES

TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA

WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030

Biswambhar Nag Das & Co:

67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

সামান্য থামলেন পুরোহিতমশাই।
লম্বা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আবার শুরু করলেন,"আমি তখন চার বছরের শিশু। ঠাকুরদা অঘোরীবাবা মাঝেমধ্যে বাড়িতে এলে আমাকে কোলে নিয়ে গল্প করতেন। সে সব ভূত-প্রেত-পরিদের গল্প। কখনওবা বলতেন সাধু-মহাত্মা,তান্ত্রিকদের গল্পও।"
আর একবার থামলেন পুরুতঠাকুর। গামছা দিয়ে ঘাড় আর মুখ মুছে নিয়ে বলতে শুরু করেন, "একটু যখন বড় হয়েছি, পাঁচ-ছ' বছরের হব তখনই শেষবারের মতো ঠাকুরদামশায় এসেছিলেন বাড়িতে। টকটকে ফরসা গায়ের রং; পাট রঙের চুলের জট তখন আরও বড়, চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছিল সদ্য ফোঁটা জবাফুলের মতো। আমি প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম দেখে, কিন্তু শিশুকাল থেকে ওই চেহারা দেখার ফলে আস্তে আস্তে ভয় দূর হল। বললেন, 'এক ঘটি জল নিয়ে আয়।' আমি জল এনে দিতেই উনি মনে মনে কিছু মন্ত্র পড়ে ঢক ঢক করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিয়ে বাকিটা আমরা যেখানে বসেছিলাম তার চারিদিকে ঢেলে একটা গোল জলের গণ্ডি কাটলেন।"
এবার পুরুতঠাকুর নিজেও খানিকটা জল খেয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "ঠাকুরদামশায় বললেন, তাঁর আশ্রমের এলাকায় ডাকাতের ভীষণ উপদ্রব হত মাঝে মাঝে দু'-তিনটি ডাকাতের দলের মধ্যে ছিল রেষারেষি। কিন্তু ওরাই ঠাকুরদাকে সাহায্য করত সাধনার জন্য তাজা নরদেহ এনে দিয়ে। কাপালিকের পূজাই ত তাজা নরদেহের উপর বসে সাধনা করা।"
ঠাকুরমশায় আবার থামলেন, ঘাড়ে-গলায় গামছা বুলিয়ে নিয়ে আমার পানে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "জামাইবাবা, বইতে পড়া কাপালিকের গল্প নয়, সত্যিকারের এক সাধকের কাহিনি, নিজের ঠাকুরদা আমার চোখে দেখা মানুষ।"

-৪-

আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানাতেই উনি আবার শুরু করলেন, "ছোট্ট আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম, ঠাকুরদামশায় আমাকে সাহস দিলেন, 'কিচ্ছু ভয় নেই বাবা, এই যে গণ্ডি দিয়েছি, কোনও বাপের ব্যাটার সাধ্য নেই এর ভিতরে ঢোকার।"
'ঠাকুরদামশায়ের গল্পের মাঝেই কখন দিনের আলো কমে এসেছিল খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে একপাল শেয়াল ডেকে উঠল,আমি তো ভয়ে মরি আর কি, রাত না হতেই শেয়ালের ডাক! ঠাকুরদা জলের গণ্ডিটা দেখিয়ে আমাকে অভয় দিলেন। শেয়ালগুলোর ডাকে বুঝি ভয় পেয়ে নদীর পাড়ের কুকুর-গুষ্ঠিও প্রাণপণ আর্তনাদ করতে লাগল।

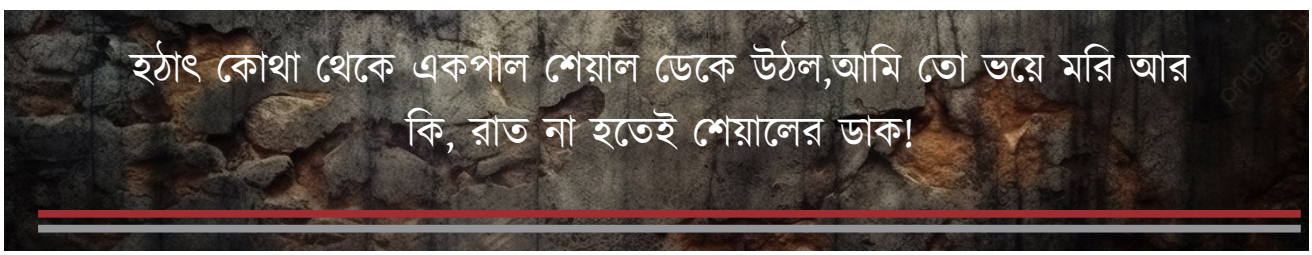

আমি ভয়ে ঠাকুরদার গা ঘেঁষে বসলাম। আমার ছোট শরীরকে এক হাত দিয়ে ঘিরে ঠাকুরদা বলতে লাগলেন, 'একবার এক ডাকাত সর্দার কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল একটা ফুটফুটে পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে, মাথা ন্যাড়া, গলায় পইতে নেই কিন্তু শরীরে সদ্য উপনয়নের চিহ্ন; সর্দার বলল, আগামী অমাবস্যায় যখন ওরা একটা বড় ডাকাতি করতে যাবে তখন ওকে মায়ের পূজায় বলি চড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানতাম বড়সড় ডাকাতির আগে ওরা নরবলি দিয়ে মায়ের পূজা করে নেয়। আর সেই সদ্য মৃতদেহ নিয়ে আমরা সাধনা করি। ওই দেহ থেকে গড়িয়ে পড়া তাজা রক্ত চেটে খেতে দ্বীপের জঙ্গল থেকে লাল, কালো,সাদা, বাদামি রঙের শেয়াল আসে" আমি ভয়ে ঠাকুরদা'র বিশাল শরীর জড়িয়ে ধরলাম।"
আবার একবার এক ঢোক জল খেয়ে পণ্ডিত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আদিনাথ শাস্ত্রী বলতে শুরু করলেন, "আমার কাপালিক ঠাকুরদা আবার বলতে লাগলেন 'অমাবস্যার রাতে ডাকাত সর্দার এল 'বলির' ছেলেটির জন্যে। ক'দিনে মায়া পড়ে গিয়েছিল ছেলেটির উপর।তাছাড়া ও বামুনের ছেলে, আমি ওকে দিতে রাজি হলাম না: সর্দারকে বললাম, "এর বলি হতে পারে না, এর দেহে খুঁত আছে- এর একটা পা খোঁড়া। আসলে, সেদিন সকালেই লাঠি মেরে ওর একটা ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিলাম আমি।"

ডাকাত সর্দার বলল,"ঠ্যাং খোঁড়া? কই দেখি তো?"

'ছেলেটি ব্যথায় দাঁড়াতেই পারছিল না। কান্নাকাটি শুরু করে দিল। ডাকাত সর্দার রেগে গিয়ে তলোয়ার তুলে ওই অবস্থাতেই ওকে মারতে উদ্যত হল। আমারও রক্ত ভীষণ গরম হয়ে উঠল, এক নিমেষে মাটিতে পোঁতা সিঁদুর মাখা মা কালীর ভারী ত্রিশূলটা তুলে সর্দারের মাথার এমন আঘাত করলাম যে তার আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি রইল না; সেই রাতেই ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাব জানি না,কিন্তু দৌড়তে লাগলাম, হাঁপিয়ে গেলে খানিক বসে আবার চলতে লাগলাম। শেষে জঙ্গলের প্রান্তে এক কুঁড়ে ঘর দেখতে পেয়ে থামলাম। জল তেষ্টা পেয়েছিল ভীষণ। এক অন্ধ বুড়ি থাকত সেই কুঁড়েতে। আওয়াজ পেয়ে বুড়ি বেরিয়ে এল। জল চাইলাম। জল খেয়ে একটু শক্তি পেয়ে আশপাশের জঙ্গল থেকে লতাপাতা আর হাড়-জোড়া গাছের পাতা তুলে এনে পাথরের উপর থেঁতো করে ছেলেটার পায়ে লাগিয়ে দিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই ছেলেটা সুস্থ হয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু পা তার আর সম্পূর্ণ ভাল হল না। ওই ভাবেই দেশ-দেশান্তর ঘুরে কয়েক বছর পর ফিরে এলাম দেশে।'

কাপালিক বটুক ঠাকুরের গল্প শেষ করে পুরোহিতমশায় একেবারেই থেমে গেলেন। ইতিমধ্যে ওঁর খাবার এসে গিয়েছিল,আমার জন্য এল সামান্য ফল আর মিষ্টি।

ঘটির জলে হাত-মুখ ধুয়ে ঠাকুরমশায় খেতে শুরু করলেন, আমি ওঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম: গল্প যে অসমাপ্ত থেকে গেল!

খানিকটা খাবার শেষ করে মুখ তুললেন ঠাকুরমশায়, "আবার মনে প্রশ্ন এসেছে?"

আমি ঘাড় নাড়লাম, "কাহিনির শেষটুকু বাকি রইল যে ঠাকুরমশায়।"

ম্লান হাসলেন, "সব কাহিনির কি শেষ থাকে জামাইবাবা।"

> কোথায় যাব জানি না,কিন্তু দৌড়তে লাগলাম, হাঁপিয়ে গেলে খানিক বসে আবার চলতে লাগলাম।

-৫-

"তবুও," আমি ক্ষীণ আপত্তি জানাই।

আবার খাওয়া থেকে মুখ তুলে পুরোহিতমশায় বললেন, "সেদিন রাতেই আমার ঠাকুরদা কিছু না বলেকয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন, আমার বাবা আর তাঁর বন্ধুরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও খবর পেলেন না; লোকে বলাবলি করে যে ডাকাতরা নাকি ধরে ওঁর গলা কেটে নদীতে ফেলে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল।"

ঠাকুরমশায়ের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল; উঠে পড়ে এক ঘটি জল বিশাল হাঁ-মুখে ঢেলে বলে উঠলেন, "বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই ওঁর বাঁচানো সেই খোঁড়া ছেলেটিই হচ্ছেন আমার বাবা, ওঁকেই ছেলেধরারা চুরি করে ডাকাত সর্দারের কাছে বিক্রি করেছিল।" এরপর পুরুতঠাকুর আর এক মিনিটও দাঁড়ালেন না; হনহন করে পুজোমণ্ডপ ছেড়ে চলে গেলেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তারাপীঠের সেই ভয়ংকর রাত

আর্যভট্ট

সবে কালীপুজো শেষ হয়েছে। বিকেলে পাড়ার চায়ের দোকানে রোজকার মতো আড্ডা চলছে। আজকের আড্ডার বিষয়বস্তু তারাপীঠের শ্মশান। কথায় কথায় অর্ক বলছিল তার সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিক দেখার খুব শখ। পটাদা বললেন, "অর্ক, তুই যদি সত্যিকারের সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিক দেখতে চাস তাহলে শিবুর সঙ্গে ওর দেশের বাড়ি ঘুরে আয়।"

অর্ক শিবুকে জিজ্ঞাসা করল, "এই শিবু, পটাদা কি বলছে শুনেছিস? তোর দেশের বাড়ি কি তারাপীঠে?"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শিবু বলল, "ঠিক তারাপীঠে নয়। তারাপীঠের শ্মশানে যে জঙ্গল আছে তার ঠিক উল্টো দিকে নিশিন্তপুরে। কেন তুই যাবি নাকি? আমি খুব শীঘ্রই দেশের বাড়ি যাব।"
অর্ক বলল, "যদি কোনও তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা করাতে পারিস তাহলে তোর সঙ্গে যেতে রাজি।"
শিবু বলে উঠল, "ওরে বাবা! আমি পারব না। আমি তান্ত্রিক দেখলে খুব ভয় পাই। তুই যদি আমার সঙ্গে দেশের বাড়ি যাস, তাহলে আমার খুড়তুতো ভাই আছে তার সঙ্গে তোকে একদিন তারাপীঠের শ্মশানে পাঠিয়ে দেব। সেখানে অনেক তান্ত্রিকের দেখা পাবি।"
অর্ক বলল, "ঠিক বলছিস তো? দেখ, তাহলে অফিস থেকে ছুটি নেব।"
স্টেশনের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। গন্তব্যস্থল বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম নিশিন্তপুর। প্রথমে ট্রেনে রামপুরহাট স্টেশন। তারপর ভাড়া গাড়িতে নিশিন্তপুর। রামপুরহাট এখন খুবই ব্যস্ত রেলওয়ে স্টেশন। এখানে ট্রেন থেকে নেমে 'তারা মা'য়ের ভক্তরা তারাপীঠ যায়। তাই রামপুরহাট এখন জমজমাট শহরে পরিণত হয়েছে। স্টেশনের বাইরে প্রচুর অটো, টোটো, ট্রেকার ও অন্যান্য প্রাইভেট ভাড়া গাড়ি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও ট্রেন এলেই এইসব গাড়ির ড্রাইভাররা গন্তব্যস্থলের নাম ধরে চিৎকার করে প্যাসেঞ্জার ধরায় ব্যস্ত থাকে। অর্ক ও শিবু স্টেশনের বাইরে এসে নিশিন্তপুর যাওয়ার একটা ছোট প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে রওনা দিল।

আরও খানিকটা এগোনোর পর সবুজ ঝোপঝাড়ের জঙ্গল দেখা গেল। তারপর এগোতেই ঘন জঙ্গল শুরু হল।

পটাদা বললেন, "শিবু, তুই তো একজন সঙ্গী খুঁজছিলি তোর সঙ্গে যাওয়ার জন্য। তাহলে অর্ককে সঙ্গে নিয়ে চলে যা।"
শিবু বলল, "অর্ক, সত্যি আমার সঙ্গে যাবি? তাহলে সামনের সপ্তাহে শনিবার ভোরে রওনা দেব। চার-পাঁচদিন থেকে ফিরে আসব।"
অর্ক বলল, "তাহলে ফাইনাল তো? পটাদা, তুমি সাক্ষী রইলে। আমি কিন্তু অফিস ছুটি নিচ্ছি।"
শিবু বলল, "একদম ফাইনাল। পটাদা জানে আমি একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। যাক তুই যখন যাবি বলছিস আর দেরি করব না। সামনের সপ্তাহে শনিবার ভোরে রওনা দেব।"
অর্ক শিবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "তাহলে পাক্কা কিন্তু।"
শিবু অর্কর হাতে ধরে বলল, "পাক্কা।"
অবশেষে আজ কাকভোরে কয়েকদিনের জন্য দুই বন্ধু (অর্ক ও শিবু) হাওড়া

কিছুটা পথ পেরিয়ে রাস্তার দু'ধারে সবুজ ধানখেত। অগ্রহায়ণ মাস, সবে ধান কাটা শুরু হয়েছে। খেতের শেষে সারি সারি গাছ আর বাংলার গ্রাম। আরও খানিকটা এগোনোর পর সবুজ ঝোপঝাড়ের জঙ্গল দেখা গেল। তারপর এগোতেই ঘন জঙ্গল শুরু হল। জঙ্গলটা এতটাই ঘন যে মেঘবিহীন আকাশে ভরা দুপুরে সূর্যের আলো ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারে না। শহরের কোলাহল মুক্ত গ্রাম। গ্রামের জঙ্গল আর সেই জঙ্গলকে দু'পাশে রেখে তার মাঝখান দিয়ে গাড়িতে যেতে অর্কর খুব আনন্দ হচ্ছিল। সে জঙ্গলের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে শিবু বলল-
- অনেক বছর পর গ্রামের বাড়ি আসছি। এই জঙ্গলের ব্যাপারে আমার বিশেষকিছু জানা নেই। তবে ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম এটাই তারাপীঠের মহাশ্মশানের জঙ্গল। জঙ্গলটা আয়তনে বিরাট বড়। এই জঙ্গলের ভিতর অনেকগুলো

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছোট ছোট জনবসতি বা গ্রাম আছে। আমাদের দেশে বাড়ির গ্রাম নিশিন্তপুরের ঠিক উল্টোদিকে তারাপীঠের মন্দির।

এবার অর্ক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল-- ভাই, আপনারা যে এই গভীর জঙ্গলের পথে যাতায়াত করেন, ভয় করে না?

ড্রাইভার উত্তরে বলল-- কী যে বলেন স্যর! পেটের দায় আমাদের এই গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। ভয় করলে না-খেয়ে মরতে হবে।

অর্ক ফের জিজ্ঞাসা করল-- এটা তো তারাপীঠের জঙ্গল, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে 'তান্ত্রিক' আছেন?

শিবু বিস্ময়ে বলল-- বলেছি তো বাড়ি পৌঁছে একদিন খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে তোকে তারাপীঠের শ্মশানে বেড়াতে পাঠাব। তখন অনেক তান্ত্রিক দেখতে পাবি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করার কি আছে?

অর্ক বলল-- আমার বহুদিনের শখ কোনও সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিকের সঙ্গে আলাপ করব। এই গভীর জঙ্গলে কোনও তান্ত্রিক থাকলে তিনি খুবই জাঁদরেল হবেন। কেননা এখানে মানুষের আনাগোনা কম।

শিবু এবার একটু রাগ দেখিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল-- এবার বুঝেছি একবার বলাতেই তুই কেন আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসতে রাজি হয়ে গেলি।

শিবুর কথার কোনও উত্তর না-দিয়ে অর্ক আবার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল-- ভাই, এই জঙ্গলে কোনও তান্ত্রিকের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

ড্রাইভার বললেন-- শুনেছি অল্প কয়েকজন তান্ত্রিক আছেন। কিন্তু ওঁরা গভীর জঙ্গলে থাকেন। অনেক বছর ধরে এই পথে গাড়ি চালাচ্ছি কিন্তু কোনওদিন জটাধারী তান্ত্রিক দেখিনি।

হঠাৎ একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার নেমে পাথর সরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল কিন্তু গাড়ি চলল না। অনেক চেষ্টা করে স্টার্ট

হচ্ছে না দেখে ড্রাইভার ওদের বলল-- স্যর, আপনারা নেমে একটু গাড়িটা ঠেলে দিন।
উপায় নেই, অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে দুই বন্ধু পিছন থেকে গাড়িটা ঠেলা দিল কিন্তু স্টার্ট নিল না। এইভাবে বারকয়েক চেষ্টা করেও সফল না-হওয়াতে ড্রাইভার ওদের গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে মেকানিক ডাকতে উল্টোদিক থেকে আসা একটা গাড়িতে উঠে শহরে গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর সন্ধ্যা নামল কিন্তু ড্রাইভারের দেখা নেই। ঘন জঙ্গলে ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। অচেনা গভীর জঙ্গলে অন্ধকারে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। শিবুকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে উৎকণ্ঠা আর ভয় ওকে চেপে ধরেছে। ছোটবেলা থেকেই অর্ক একটু অকুতোভয় ও ডানপিটে। শিবু ভয়ে আমতা আমতা করে অর্ককে জিজ্ঞাসা করল-- কী রে, ড্রাইভারের তো দেখা নেই। আমাদের জঙ্গলে রাত কাটাতে হবে নাকি?
অর্ক বলল-- ড্রাইভার না-ফেরা পর্যন্ত তোর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।
এই বলে অর্ক গাড়ির ভেতরে রাখা ব্যাগ থেকে টর্চ বার করার জন্য গাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় 'জয় তারা' বিকট আওয়াজে থতমত খেয়ে গেল। এদিকে বাবা গো, মা গো বলে শিবু ভিরমি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। নিজেকে সামলিয়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে অর্ক দেখল লাল কৌপীনধারী কপালে লাল সিঁদুর ও সারা শরীরে ছাই লেপা ভয়ংকর দেখতে দশাসই চেহারার এক জটাধারী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর একহাতে ত্রিশূল অন্যহাতে কমণ্ডলু। অন্ধকারে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না। তবে অর্ক যেটুকু বুঝল তাতে ওর মনে হল ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিক হবেন। মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে অর্ক তান্ত্রিকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুই? রাত্রে এখানে কি করছিস?"
অর্ক কাঁপা স্বরে বলল, "বাবা, জঙ্গলের বাইরে নিশিন্তপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম। পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। ড্রাইভার আমাদের অপেক্ষা করতে বলে মেকানিক খুঁজতে শহরে গেছে।"
বাজখাঁই গলায় তান্ত্রিক বললেন, "তোর সঙ্গী তো আমাকে দেখে ভিরমি খেয়েছে।"
এই বলেই তান্ত্রিক কমণ্ডলু থেকে হাতে জল নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে শিবুর গায়ে ছিটিয়ে দিতেই শিবুর জ্ঞান ফিরল। কিন্তু অন্ধকারে সামনে তান্ত্রিককে দেখে ভয়ে আবারও জ্ঞান হারাল। আবার কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে ছিটিয়ে দিতে শিবুর জ্ঞান ফিরল। অর্ক তাড়াতাড়ি শিবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমাদের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। তুই বাবাকে প্রণাম কর।"
অর্কর কথায় শিবু ঘোরের মধ্যেই বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।
এবার তান্ত্রিক জিজ্ঞাসা করলেন, "তোরা কি এখানেই রাত কাটাবি নাকি আমার কুটিরে গিয়ে বিশ্রাম নিবি।"
অর্ক বলল, "বাবা, ড্রাইভার মেকানিক নিয়ে ফিরলে গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। তখন আমরা নিশিন্তপুরে আত্মীয়ের বাড়ি রওনা দেব। তাই আমরা এখানেই অপেক্ষা করতে চাই।"
অর্কর কথা শুনে তান্ত্রিক বললেন, "কোথায়

এবার তান্ত্রিক জিজ্ঞাসা করলেন, "তোরা কি এখানেই রাত কাটাবি নাকি আমার কুটিরে গিয়ে বিশ্রাম নিবি।"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তোদের গাড়ি! আমি তো কিছুই দেখতে পারছি না। আজ রাতে তোদের ড্রাইভার এই জঙ্গলে আর আসবে না। তার থেকে ভালো আমার সঙ্গে কুটিরে আয়। আজ অমাবস্যা। রাতে মায়ের মহাযজ্ঞ করব। তোরা দেখবি না?"

দুই বন্ধু সামনে তাকিয়ে দেখে, সত্যিই ওদের গাড়িটা নেই। তাহলে তান্ত্রিক মন্ত্রবলে একটা আস্ত গাড়ি ভ্যানিশ করে দিলেন। অর্কর মনে হল ইনি সত্যিই সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিক। তাছাড়া কোনও সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিকের কুটিরে বসে অমাবস্যার রাতে 'তারা মা'য়ের মহাযজ্ঞ দেখবে, এটা তো অর্কর বহুদিনের ইচ্ছা। তাই লোভ সামলাতে না-পেরে অর্ক রাজি হয়ে গেল। কিন্তু শিবু কিছুতেই তান্ত্রিকের কুটিরে যেতে রাজি নয়। অনেক বুঝিয়েও যখন ওকে রাজি করানো যাচ্ছে না তখন তান্ত্রিক কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে শিবুর গায়ে ছিটিয়ে দিতেই শিবু অজ্ঞান হয়ে গেল। অর্ক তো এসব দেখে তাজ্জব বনে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তান্ত্রিক শিবুকে কাঁধে তুলে নিয়ে গভীর জঙ্গলের পথে হাঁটা লাগালেন। আর অর্ককে অনুসরণ করতে বললেন ওঁকে। অকুতোভয় অর্ক কেমন যেন ঘোরের মধ্যে তান্ত্রিকের পিছন পিছন হাঁটতে থাকল।

গভীর জঙ্গলের ভেতর গাছগাছালি ঘেরা ছোট্ট উন্মুক্ত স্থানে একটা পর্ণকুটির। কুটিরের ভেতর দুটি ছোট ঘর। একটাতে 'মা তারা'র মাটির মূর্তি। অন্যটি তান্ত্রিকের শোয়ার ঘর। তান্ত্রিক নিজের ঘরে প্রবেশ করে শিবুর সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা মাদুরের উপর শুইয়ে দিলেন। অর্ক ঘোরের মধ্যে কখন যে তান্ত্রিকের পিছন পিছন এই পর্ণকুটিরে প্রবেশ করেছে তা বুঝতেই পারেনি। যখন ওর ঘোর কাটলো তখন পাশের 'মা তারা'র ঘরে তান্ত্রিকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। গাছগাছালি আর দরমার তৈরি পর্ণকুটিরের দরমার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে তাকাতেই অর্ক চমকে উঠল! দেখে তান্ত্রিক 'মা তারা'র মূর্তির সঙ্গে কথা বলছেন। অর্ক ভাবল সে ভুল দেখছে না তো? চোখ কচলে কান খাড়া করে দরমার ফাঁক দিয়ে সে আবারও পাশের ঘরে তাকাল। স্পষ্ট দেখল তান্ত্রিক 'মা তারা'র মূর্তির সামনে করজোড়ে বসে বলছেন, "মা, আজ অমাবস্যার রাতে তোকে নররক্ত পান করাব। এবার আমায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করাবি তো?" বলেই সামনে রাখা পাত্র থেকে এক গ্লাস সুরা গলায় ঢেলে দিলেন। অর্ক চারিদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে ঘরে তান্ত্রিক ও 'মা তারা'র মূর্তি ছাড়া কয়েকটি নরকঙ্কাল আছে। সুরা পান করে তান্ত্রিক কমণ্ডলু থেকে হাতে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে মা তারা'র পায়ের সামনে রাখা একটা নরকঙ্কালের উপর সেই মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে 'জয় তারা' বলে বিকট চিৎকার করে উঠলেন। সঙ্গেসঙ্গে সেই নরকঙ্কাল জ্যান্ত মানুষের রূপ ধারণ করল। এরপর ঘরে থাকা নরকঙ্কালগুলোর উপর তান্ত্রিক কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে 'মা তারা'র জয়ধ্বনি করে তাদের সকলকে জ্যান্ত করে তুললেন।

অর্কর মনে পড়ল সে গল্পে পড়েছিল শয়তান তান্ত্রিকরা সিদ্ধিলাভের পর পিশাচসিদ্ধ হন। তখন তারা মৃত মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। অর্ক বুঝতে পারল যে তারা শয়তান তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়েছে। তান্ত্রিক আজ অমাবস্যার রাতেই 'মা তারা'র সামনে ওদের দু'জনকে বলি দেবে। নিজের ভুল আর বোকামি বুঝতে পেরে অর্ক আপশোস করতে লাগল। সে ভাবল কেন যে তান্ত্রিকের পিছু নিলাম, এখন ওর ভুলে দুজনেই মৃত্যুর ফাঁদে আটকে পড়েছে। যে-কোনও উপায়ে এখান থেকে ওদের পালাতে হবে। অর্ক এবার শিবুর মুখের কাছে মুখ এনে ওর নাম ধরে আস্তে আস্তে ডাকতে শুরু করল। অনেক ডাকাডাকির পর শিবুর জ্ঞান ফিরল। এমন সময় রে রে করে তান্ত্রিক নরপিশাচদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। পিশাচদের সে কি উল্লাস। এরপর তান্ত্রিক ওদের দুজনকে ঘরের বাইরে এনে স্নান করিয়ে, কপালে সিঁদুরের তিলক এঁকে পিছমোড়া করে হাড়িকাটে গলা আটকে দিল।

দুই বন্ধু দেখল অমাবস্যার তমিস্রা রাতে ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে 'মা তারা'র মহাযজ্ঞ শুরু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হল। শুকনো বেল কাঠে ঘি মাখিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তান্ত্রিক তাতে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এটা-ওটা ছুড়ে মারছেন আর তাতে আগুনের লেলিহান শিখা লম্বা হয়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। মাঝেমধ্যে ওদের দিকেও ছুড়ে মারছেন আর তাতে ওদের শরীরে একটা তীব্র জ্বালা হচ্ছে। ওদের দুজনকে কেন্দ্র করে নরপিশাচদের গোল করে উদোম নৃত্য, আর ঢাক-ঢোল-কাঁসরের শব্দের সঙ্গে তান্ত্রিকের উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ মিলেমিশে এক ভয়ার্ত আবহের সৃষ্টি হচ্ছিল। সে আবহ রাত্রির নির্জনতা ভেদ করে বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল, শরীরের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। হাড়িকাটে মাথা আটকে থাকলেও ওদের মনে হল আকাশে কালো মেঘের দল সার বেঁধে ভেসে যাচ্ছে। দূরে জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওরা বুকের ভেতর নিজেদের হৃদকম্পন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল। ভয়ানক কিছু একটা আশঙ্কায় ওদের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আগুনের লেলিহান শিখায় তান্ত্রিকের চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠছিল ভয়ংকর এক নিষ্ঠুর শয়তানি হাসি। সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যাচ্ছিল না।

দুই বন্ধু নিজেদের মৃত্যুর শেষদৃশ্যটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। অর্ক ঈশ্বরকে স্মরণ করে মনে মনে বলল, "হা ঈশ্বর! আমরা কার পাল্লায় পড়লাম। সত্যিকারের সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিক দেখতে এসে শেষপর্যন্ত শয়তান তান্ত্রিকের হাতে পড়লাম। সত্য ও ন্যায় কি পরাজিত হবে। আর কী বেঁচে বাড়ি ফিরতে পারব না!" তার বারবার মনে হচ্ছিল নিশ্চিত মৃত্যু ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। এইসময় শয়তান তান্ত্রিকের হাত থেকে ওদের রক্ষা করার কেউ নেই। এই বুঝি তান্ত্রিক এসে খাঁড়া দিয়ে ওদের ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে দেবেন। পাশের হাড়িকাটে মাথা আটকানো শিবুর দিকে কোনওমতে তাকিয়ে

অর্ক দেখল বেচারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। অর্ক বুঝল যে তার অতি উৎসাহ নিজের ও শিবুর জীবনে মৃত্যু ডেকে এনেছে। ওর মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। অর্ক ফিসফিস করে শিবুকে বলল, "আমার দুঃসাহস এই বিপদ ডেকে আনল। আমায় ক্ষমা করে দিস ভাই।" চারিদিকে চিৎকার, আনন্দ উল্লাসের মধ্যেও অর্কর মনে হল জগৎ-সংসার অন্ধকার হয়ে আসছে। নিজের মায়ের মুখটা ওর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে। মনে হল, আর কোনওদিন মাকে দেখতে পাবে না। একে একে ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কথাও ওর মনে পড়ছে। পরক্ষণেই অর্ক 'মা তারা'র শরণাপন্ন হল। মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হলে বুঝি এমনই হয়। মরার পর বাড়ির লোকজনও জানতে পারবে না ওদের মৃত্যুর কারণ। অর্ক ভাবল ওর মতো শিবুও হয়তো একই কথা ভাবছে। দেশের বাড়ি বেড়াতে এসে অর্কর গোঁয়ার্তুমির জন্য বেঘোরে তারও প্রাণটা যাবে। এবার অর্কর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে এল। অর্ক শুনেছিল মানুষ মৃত্যুর আগে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে। তাই সে প্রাণপণে 'মা তারা'র নাম নিতে থাকল। তান্ত্রিক ওদের দুজনকে বলি দেওয়ার জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন। ওদের ধোঁকা দিয়েছেন। অর্ক ভাবল তখন যদি শিবুর কথা শুনত তাহলে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হত না।

দীর্ঘসময় হাড়িকাটে গলা আটকে থাকায় অর্কর মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছিল। চারপাশের চিৎকারে মস্তিষ্কের ভেতরটাও চিনচিন করছিল। গলায় বেশ ব্যথা অনুভব করল। হাত-পা সব অবশ হয়ে আসছিল। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে তান্ত্রিক হাতে একটা বড় সিঁদুর মাখা খাঁড়া নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। দূর থেকে অট্টহাসি হেসে বললেন, "মায়ের প্রসাদ হওয়ার জন্য তোরা প্রস্তুত হ।" তাঁর বীভৎস মুখ দেখে অর্ক দু'চোখ বুজল আর একনাগাড়ে তারা মায়ের নাম জপতে লাগল।

হঠাৎ তীব্র ঝড়ের দমকা হাওয়ায় চারদিক লন্ডভন্ড হতে থাকল। নরপিশাচরা ওদের দুজনকে গোল করে ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল। হঠাৎই আকাশে জমাটবাঁধা কালো মেঘের ভেতর থেকে একটা তীব্র বড় আলোর ঝলকানি বেরিয়ে এল, পরমুহূর্তে বিকট আওয়াজ তুলে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। ভয়ে দুই বন্ধু দু'চোখ বন্ধ করে ফেলল। চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল। অর্ক চোখ খুলে দেখে বিদ্যুতের ঝলকানিতে চারদিকে আগুন লেগেছে। লোহার খাঁড়া হাতে থাকায় বাজের তড়িতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তান্ত্রিকের মৃত শরীরটা মাটিতে পড়ে রয়েছে। নরপিশাচদের কোনও অস্তিত্ব তার চোখে পড়ল না। কেবল কিছু নরমুণ্ড আর নরকঙ্কালের হাড়গোড় এদিকে-সেদিকে পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর বিদ্যুতের ঝলকানি বন্ধ হয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টিতে আগুন নিভে গেল। হঠাৎ চারদিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গিয়ে বড্ড নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এরপর কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অর্ক অনুভব করল বৃষ্টির সঙ্গে শীতল হাওয়া নিস্তেজ শরীরটাকে যেন সতেজ করে তুলল। হঠাৎ ওর গলা থেকে কাঠের খিলানটা খুলে পরে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখে শিবুর গলা থেকেও কাঠের খিলান খুলে গেছে। অর্ক বুঝল শুভ শক্তির কাছে অশুভ শক্তির পরাজয় হয়েছে।

"স্যর, একটু জল খান"--
এই বলে গাড়ির ড্রাইভার জলের বোতলটা অর্কর দিকে এগিয়ে দিল। চোখ মেলে অর্ক দেখল জঙ্গলে যেখানে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল সেই রাস্তার ধারে সে ও শিবু শুয়ে আছে। অন্ধকার শেষ হয়ে ভোরের নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। ঘন জঙ্গলের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নরম রোদের আলো তাদের শরীরের উপর পড়েছে। গাছে গাছে পাখিদের কলতান। অর্ক ড্রাইভারের হাত থেকে জলের বোতলটা নিয়ে কয়েক ঢোক জল গলায় ঢেলে বোতলটা শিবুর দিকে বাড়িয়ে বলল, "নে জল খা। তোদের গ্রামের বাড়ি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাদুড় পিশাচ ও সেই তান্ত্রিক

ফটিকচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিয়াগড় গ্রাম। সামনে গভীর জলের পদ্মদিঘি। তারই পাড়ে বুড়ো বট গাছ, সঙ্গে বিরাট আকারের বেল, দুটো গাছ যেন মা তার কোলে সন্তান। সারা বছর কালী, শীতলা, শিব, ষষ্ঠী নানান পুজোয় গ্রামের জেলেপাড়ার পরিবারগুলো মেতে থাকে। কিন্তু কাল রাতের বিধ্বংসী ঝড়ে সব লন্ডভন্ড হয়ে যায়। গ্রামে টালি-টিনের ঘরবাড়ি, গাছপালা অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বটতলায় এসে সকলের মন খারাপ। গাছের ডালপালা অল্প বিস্তর নষ্ট হয়েছে। কিন্তু বেলগাছ কোমর থেকে ভেঙে ঝুলছে। লাউয়ের মতো বেল যেমন মিষ্টি তেমনই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাখনের মতো। গ্রামের বিশ্বাস, এসব শিবের প্রসাদমাহাত্ম্য।
সন্ধে হতেই জেলেপাড়ার শ'খানেক মানুষ গুটিগুটি পায়ে বটতলায় হাজির হয়। অভয়জ্যাঠা, সতীশকাকা, থানের কোনায় বসে। বাকি সবাই দাঁড়িয়ে।
-অশুদ্ধ একটা তো হয়েছে। নয়তো পোয়াতি বেল গাছটা ভাঙবে কেন? কত গুটি এসেছিল।
রমলামাসির কথায় গুপী বলে, পাপ-পুন্নি যাই থাক, ঝড় বেকায়দায় হয়েছে।
-দেখো, এখন এসব ভেবে লাভ নেই, বরং আগামী চৈত্রে গাজনের আগে কি করা যায়, সেটাই ভাবো। দরকার হয় ভাঙা গাছ কেটে নতুন চারা লাগাও।

ডালে তখন অসংখ্য বাদুড়ের ডানা ঝাপটানো, তাদের কর্কশ ডাক, সন্ধে হলেই পদ্মপুকুর পাড়ে পরিবেশ যেন ভয়ার্ত করে তোলে। গুপী, বিনোদ, জগা ক্লাবে তাস খেলা শেষ করে বটের নিচ দিয়ে বাড়ি ফেরে। ভাঙা বেল গাছের দিকে তাকিয়ে জগা বলে, সত্যি খুব খারাপ লাগছে বেল গাছের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।
- দেখ,পাতাগুলো কেমন নেতিয়ে পড়েছে। গাছের কষ্ট কেউ বুঝবে না। গুপীর কথা শেষ না-হতেই উপর থেকে ছরছর করে জল পড়ে। বিনোদ সরে যায়। উপরে তাকায়। ওই দেখ, মাথার ওপর একপাল হনুমান।
জমাট অন্ধকারে ওরা গ্রামে প্রবেশ করে।

শুধু বলছেন, বাদুড় পিশাচের ভয়ংকর নজর এখন জেলেপাড়ায়। বেলগাছ ভেঙে ওই থানে পিশাচ ভর করেছে। কী যে ক্ষতি হবে, কে জানে!

সতীশকাকার কথায় অভয়জ্যাঠা সম্মতি দেয়।
এরই মধ্যে পঞ্চায়েত মেম্বার গোকুল কীর্তনিয়া আসে। একবার চোখ বুলিয়ে বলে, ঠাকুরের খোলা থান, ঝড়বৃষ্টি হবেই। কিন্তু সামনে গাজন, সেটা আগে ভাবো।
আলোকাকি থান শুদ্ধর উপায় বলে, পূজা তো হইবো, আগে ওই ব্যালগাছ গঙ্গায় দিতে হইবো। তিন ঘড়া দুধ দিয়া থান শুদ্ধি করবা। নচেৎ মহাবিপদ।
আলোচনা চলতে থাকে। জেলেপাড়ার মেয়ে বউ সকলেই বেলগাছ কাটার বিরুদ্ধে। অথচ ভাঙা গাছের কি হবে? অবশেষে ব্যানার্জিদিদার উপদেশ সকলেই শোনে। ঠিক হয়, কোনও শুভ দিনে পুরোহিত ডেকে ভাঙা বেলকাঠে শিবের যজ্ঞ করে আসন শুদ্ধি করতে হবে। তারপর গাজনের আয়োজন।
আলোচনা শেষ হলে সকলে বাড়ির পথ ধরে। চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। বিরাট বট গাছের

পর্ব ২

ভোর হতেই কালিয়াগড় গ্রাম-সহ আশপাশের অঞ্চলে রটে যায়, বটতলায় ঠাকুরের থানে এক তান্ত্রিকবাবা এসেছেন। শুধু বলছেন, বাদুড় পিশাচের ভয়ংকর নজর এখন জেলেপাড়ায়। বেলগাছ ভেঙে ওই থানে পিশাচ ভর করেছে। কী যে ক্ষতি হবে, কে জানে!
দলে দলে গ্রামের মানুষ হঠাৎ তান্ত্রিক দেখে অবাক। তামাটে গায়ের রং।কালো কাপড়, মাথায় সোনালি জটা, তার উপরে সাদা কাপড়ে ফেট্টি বাঁধা। গালে দড়ি পাকানো দাড়ি, দু হাতে তিনফেটি রুদ্রাক্ষ, গলায় রঙিন পুঁতির অজস্র মালা। কপাল জুড়ে কৈলাসপতির তিন দাগের খড়ি তিলক। প্রথম নজরে ভয় পেলেও মায়াময় চোখের দিকে তাকালে মনের গভীরে প্রশান্তি আসবেই। মাঝে মাঝেই চিৎকার করছে, ওম হাম হাম সত্রস্তম্ভনায় হাম হাম ওম ফুট |

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

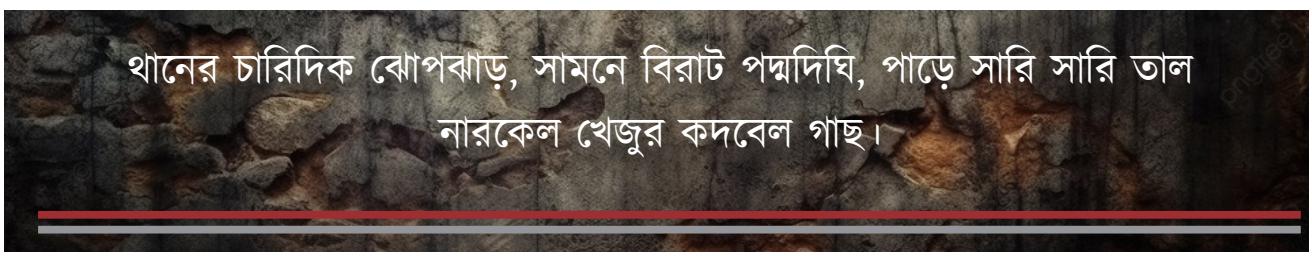

ইতিমধ্যে গ্রামে বাচ্চা-বুড়ো সকলেই উপস্থিত। মানুষজন ঘিরে ধরেছে তান্ত্রিকবাবাজিকে।
-ও সাধুভাই, কোথা থেকে আইছ? এখানে কিসের লাইগ্যা আইলা?
রামলামাসির কথায় তান্ত্রিকের কোনও সাড়া নেই।
-বলি কি মতলবে আইছ? এই থান অসুচ লাগছে। পাপ হইছে। শুদ্ধিকরণ লাগবো। তুমি বাপু কেটে পড়ো। নিস্তারিণীর কাঠ কাঠ কথায় নির্বিকার তান্ত্রিক।
-জানিনে বাপু, এ যে কি ভাষা বোঝে । কিছুই তো কয় না।
হঠাৎ তান্ত্রিকবাবা গর্জে উঠলেন,
ওম তৎপুরুষায় বিদমহে মহাদেবায় দীমাহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।
মুহূর্তে তান্ত্রিকের হুংকারে নির্জন পুজোর থানে যেন বজ্রনিনাদ শোনা গেল। চোখদুটো রক্তজবার মতো লাল হয়ে ওঠে, সকলে পিছিয়ে যায়।
রমলা ফিসফিস করে বলে, কি ভাষারে আলো? আসতে কইতে জানে না? গলা খেকাইয়া কয়...
এর মধ্যে গ্রামসদস্য গোকুল, সতীশকাকা, অভয়জ্যাঠা, গুপী, নিতাই, ঝটিমনা, পলু সকলেই হাজির। ব্যানার্জিদিদা, কাঁকন, অণু অনেক মেয়ে বউ ঝি এসেছে। ওদিক থেকে পরেশ গৌড়া বিন্দু অশোক মাছের আড়ত হয়ে সোজা বটের থানে।
কথা শুরু হয়। তান্ত্রিকের নাম গণ্ডকী বাবা। নেপালের গণ্ডকী নদীতীর থেকে ঘুরতে ঘুরতে শিবের থানে। স্বপ্নে বাদুড় পিশাচের খবর পেয়েছে। তন্ত্রসাধনায় এই পিশাচ পাওয়া খুবই কঠিন। তাই হাজির।
- কিন্তু বাবা, এইযে বেল গাছে, এর কি গতি হবে? গাজনের পুজো কি হবে? পাপ হবে না?
সতীশকাকার কথায় তান্ত্রিকবাবা হাতের ত্রিশুল ঝাঁকিয়ে বলে, ব্যোম ভোলে, বাবা আছেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবেই।
একমাস এখানে অদৃশ্য পিশাচ তপস্যা করব। সব শুদ্ধ হয়ে যাবে। তার জন্য চারদিক কালো কাপড়ে আড়াল করতে হবে। অস্তমিত সূর্য। শুধু সকালে এককাপ চা আর সন্ধ্যাকালে একগণ্ডূষ দুধ, মালসায় এক ফুট আতপের সঙ্গে আলুসিদ্ধ আর তিলপোড়া। এটুকুই যথেষ্ট।
সকলেই মেনে নেয়। কিন্তু সকালের চা আর সন্ধেবেলায় অন্ন দেবে কে?
গ্রামের মেয়ে-বউরা কেউ তান্ত্রিকবাবার কাছে আসতে রাজি হয় না। হঠাৎ আলোকাকি বলে ওঠে, ওরে তোরা গৌরীকে বল, বেচারা বিধবা মেয়ে, শুধু পিসির কাছে ঝাঁটা-লাথি খায়, তবু ঠাকুর সেবায় যদি সুখ-শান্তি ফিরে পায়। ওকে খপর দে, ঠিক পারবে।

থানের চারিদিক ঝোপঝাড়, সামনে বিরাট পদ্মদিঘি, পাড়ে সারি সারি তাল নারকেল খেজুর কদবেল গাছ।

পর্ব ৩

দীর্ঘ প্রায় একমাস চারিদিক টিন দিয়ে ঘেরা, তার বাইরে কালো কাপড়ের বেষ্টনী। শুধু সামনে একফালি মাথা গলানো উন্মুক্ত অংশ। সেখান থেকেই গৌরী চা, জল, সিদ্ধ আতপ মালসা, তিলপোড়া জল দেয়। থানের চারিদিক ঝোপঝাড়, সামনে বিরাট পদ্মদিঘি, পাড়ে সারি সারি তাল নারকেল খেজুর কদবেল গাছ। সবুজ বনানীর মধ্যে ছোট ছোট ঘর, জেলেদের শান্ত সংসার, গরু হাঁস ছাগল প্রতিপালন, সঙ্গে জাল আর বিড়ি বাঁধা। সূর্য ডোবার পর গ্রামে কুপি জ্বলে ওঠে, আর ভোর হলেই জাল হাঁড়ি নিয়ে জেলেদের হাঁকডাক।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেদিন ভোর অন্ধকার থাকতে বিন্দু অশোক রাস্তায় যেতে গিয়ে হঠাৎ শিবের থানে চোখ যায়। একটা ছায়ামূর্তি বটের ডাল বেয়ে নামছে।

- এই বিন্দু, ওই দেখ, তান্ত্রিক গাছ থেকে নামছে না? রাতে কি গাছে থাকে?

- সেটাই তো দেখছি। কিন্তু হাতে ওটা কি? অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। ওই তো পুকুর ঘাটে নামে। কিছু ধুচ্ছে মনে হয়। অশোক উত্তর দেয়।

- নারিকেল গাছের আড়ালে চল, দেখি বেটাকে। বিন্দু অশোক একটু অপেক্ষা করার পর যা দেখে, ভয়তে আঁতকে ওঠে। তান্ত্রিক একটা বিশাল আকার বাদুড় ধরে ঘাটের ধারে আগুন জ্বালিয়ে কীসব করছে! আগুনের লেলিহান শিখায় তান্ত্রিকের মুখ জ্বলজ্বল করছে। ভয়ংকর চোখদুটো রক্তবর্ণ,

আমারও পা অবশ হয়ে গেছে। এ তো ভয়ংকর দৃশ্য। চল, পালিয়ে যাই। তান্ত্রিকবাবা এক্ষুণি উঠবে। আমাদের ক্ষতি করতে পারে।

অগ্নি শিখায় বাদুড় পুড়ছে। ডানা দুটো ঝটপট করছে। এবার তান্ত্রিকবাবা নাচানাচি শুরু করে। পা দুটো যেন মাটিতে নেই। ওদিকে বটের থানের গুপ্ত ঘর থেকে ধীর পায়ে এক নারী মূর্তি বেরিয়ে আসে।

- এই বিন্দু, ওই দেখ, কে ওটা?

- আরে, এ তো আমাদের গৌরী মনে হয়। কি সাংঘাতিক কাণ্ড। ও এখানে কি করছে? বেটা সাধু মহাধড়িবাজ।

- শব্দ করিস না, শুধু দেখে যা। বলেই দুজনায় মুখে আঙুল দেয়।

মুহূর্তে তান্ত্রিক ঝলসানো বাদুড়কে দুহাতে তুলে আকাশে উড়িয়ে সেই নারীমূর্তির সামনে দাঁড়ায়। নারী এলোচুলে বিকট নৃত্য শুরু করে। তান্ত্রিক মালসায় জল নিয়ে আগুনে দেয়। নারী, বাদুড়ের মতো ডেকে ওঠে। আগুনের লেলিহান শিখা হিলহিল করে উপরে উঠতেই তান্ত্রিক আগুনের ভিতরে প্রবেশ করে। গৌরী ধপ করে বসে পড়ে।

- এই বিন্দু, কি সাংঘাতিক ব্যাপার। কি হচ্ছে?

-আরে তন্ত্রমন্ত্রে কত কি সাধনা আছে জানিস? চুপচাপ দেখে যা।

মুহূর্তে তান্ত্রিকবাবা আগুন থেকে বেরিয়ে জলে ঝাঁপ দেয়। বিরাট একটা ঢেউ পদ্মদিঘির জল উথালপাথাল করে।

- এই অশোক, আমার তো হাতপা ঠান্ডা হয়ে আসছে।

- আমারও পা অবশ হয়ে গেছে। এ তো ভয়ংকর দৃশ্য। চল, পালিয়ে যাই। তান্ত্রিকবাবা এক্ষুণি উঠবে। আমাদের ক্ষতি করতে পারে।

ওরা পাশ ফিরতেই দেখে বাবা দূরে দাঁড়িয়ে ডাকছে।

অশোক বিন্দু নির্বাক হয়ে কাছে যায়। সামনে তাকায়। অবাক কাণ্ড। শান্ত নম্র কালো পোশাকের সেই তান্ত্রিক। একটু আগের ভয়ংকর মূর্তি কোথায় !

- যা দেখেছ ভুলে যাও। গ্রামের কেউ যেন জানতে না পারে, বাদুড় পিশাচ থেকে মুক্তি লাভের উপায় পেয়ে গেছি। কঠিন সাধনা। তবেই মুক্তি। গ্রামের মুক্তি। গৌরীর মুক্তি। চুপচাপ চলে যা।

বিন্দু নিতাই কোনও কথা না বলে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তারপর সাইকেল নিয়ে চলে যায়। একটু পরে ওরা পরেশদের বাড়ির সামনে দাঁড়ায়।

- এই বিন্দু, তান্ত্রিকের সামনে গৌরী ছিল না? চল তো, বেণুপিসির বাড়ি। গৌরী আছে কি না দেখি।

- তাই চল ।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। শুধু পূবের আকাশে একফালি মেঘ হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। নির্জন পদ্মদিঘির পাড়ে সবুজ গাছপালার ভিতর থেকে দুএকটা পাখি ডাকছে। দিঘির ওপাশে নিস্তারিণীর বাঁশঝাড়ে হুতুম পেঁচা ডাকছে। পশ্চিম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশে তখনও মোমফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। নির্জন জেলেপাড়া। তার মধ্যে চৌমাথা থেকে চিৎকার, এই গণেশ, জাল গোছা। আবার হাঁক, এই নিতাই, বাদাম বিলে আয়, ভোর রাতের হাঁকডাকে জেলেপাড়ার ঘুম ভাঙে।

ওরা গুটিগুটি পায়ে বেণুপিসির বাড়ির উঠোনে দাঁড়ায়।

- পিসি আছ নাকি? ও বেণুপিসি।

কোনও উত্তর নেই দেখে বিন্দু বলে, টিনের দরজায় টোকা দে।

অশোক ঠক ঠক করতেই ভিতর থেকে পিসির গলা, কে রে ? অণু নাকি? আইতাছি, আজ কোন পুকুরে যামু? গুগলি পাইমু তো?

কিন্তু বাইরে এসে যেন ঘুম ভাঙে। বিন্দু অশোক, তোরা এই ভোরকালে?

- পিসি, গৌরী আছে?

-আ মরণ, রাত থাকতে গৌরীর খোঁজ?

- না না পিসি, একটু ডেকে দেবে? আজ শনিবার,তান্ত্রিকের চাল আছে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করতাম।

ও গৌরী, গৌরী, অশোক বিন্দু আইছে, কি জিগায় দেখ, আমি একটু বাহ্য করে আসি।

- কও দাদা, এই ভোরকালে?

- গৌরী, তুই রাতে ওই শিবের থানে গেছিলি?

- না তো দাদা, ঘুমাইছিলাম, কেন দাদা?

- না রে, তোর মতো কারে যেন দেখলাম। অন্ধকারে ভুল হইতে পারে। ঠিক আছে। তুই দুয়ার দে।

গৌরী ঘরে যায়, মনটা খচ খচ করে। ভোরের স্বপ্ন ওরা জানলো কেমনে? সত্যি গৌরী গেছিল। তান্ত্রিকবাবা স্বপ্নে আইছিল। আগুন, বাদুড়, পদ্মদিঘির ঢেউ... আর তো মনে পড়ে না। স্বপ্নের কথা ওরা জানলো কেমনে?

পর্ব ৪

সবে সন্ধে হয়েছে। রোজকার মতো গণ্ডকীবাবা টিনের ঘর থেকে উঁকি দেয়। সামনে চাটাই পেতে জেলে পাড়ার বউ-ঝি ছেলেপুলে নিয়ে হাজির। এই কয়েকদিনে সকলেই জেনে গেছে তান্ত্রিকবাবা শাস্ত্রপাঠ ভালোই জানে। তিনি মহাকাল শিবের ভক্ত। তাই এ জীবনে পাপ মুক্ত করতে সকলেই তান্ত্রিকের অমৃতবাণী শুনতে আসে।

আজ সোমবার, ভোলে বাবার পুজোর দিন। তিনু হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে গেছে। শুদ্ধ মনে সকলে বসতেই আলোদিদা মাথায় গঙ্গাজল ছিটায়।

রমলামাসি ধূপ জ্বালায়। সবাই চুপ।
বাবা দূরের ধূসর আকাশের দিকে তাকায়।

সকলকে টিপ দেয়। এবার টিনের দরজায় সাগরী টোকা দিতেই বাবা বেরিয়ে আসে। ব্যোম ভোলে, বিকট চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে, বাবা সুপারিপাতার বাকলে বসে। রক্তজবা চোখ, ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি, কপাল জুড়ে চন্দন মাটি। রমলামাসি ধূপ জ্বালায়। সবাই চুপ। বাবা দূরের ধূসর আকাশের দিকে তাকায়। বলতে শুরু করে, "শিবের পরম সত্যের সঙ্গে তাঁর শক্তির প্রকাশস্বরূপ এই বিশ্বের প্রতিটি সজীব নির্জীব বস্তুকণাকে সংযুক্ত করে তন্ত্র। তাই মহাতন্ত্রের উৎপত্তি স্থল কৈলাস, বাবা মহেশ্বর থেকে। সেই তন্ত্র স্রোত ধারা পরম্পরায় চলে আসছে। এটি আগম, তবে ছন্দোবদ্ধ। মহাভারতের সব তন্ত্রশাস্ত্র সার কথা সেই সত্যের সন্ধান দেয়। বলতে বলতে তান্ত্রিকবাবা সামনে কয়েক টুকরো বেল কাঠ নিয়ে হাতের তালুতে ঘষে। মুহূর্তে আগুন জ্বলে ওঠে। আরতির মতো তিনবার হাত ঘুরিয়ে নিচের বেল কাঠ ধরায়। মন্ত্র উচ্চারণ করে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নমঃ শিবায় শান্তায় কারুণাত্রায়
হেতবে নিবেদিতামি চাত্মানং ত্বং গত্বিং
পরমেশ্বরম,,তস্মৈ নমঃ পরমকারণ কারণায়
দীপ্তোজ্জ্বলজ্জ্বলিত পিঙ্গললোচনায়!
নাগেন্দ্রহাররকৃত কুণ্ডলভূষণা...
দেখতে দেখতে তান্ত্রিকবাবা আগুনের উপরে হাত রেখে ধ্যানস্থ হলেন। চোখ বন্ধ, আগুনের শিখায় গৈরিক মুখমণ্ডল যেন স্বয়ং মহাদেবের আবির্ভাব। সকলেই জোড়হাত করে প্রণাম করে। উলু দেয়। বাবা গম্ভীর গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করেন।
ঐঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভাং।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।।
শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্।
ঐঁ এষ ধূপঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ এষ দীপঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং বাণেশ্বরশিবায় নিবেদয়ামি।
ঐঁ ইদং পানার্থোদকং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং পুনরাচমনীয়ং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং তাম্বুলং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং মাল্যং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
মন্ত্র শেষ হতেই হঠাৎ তান্ত্রিকবাবা এক মুঠো ছাই হাতে তুলে দাঁড়ায়। উপরের দিকে নিক্ষেপ করে চিৎকার করে। এবার বেরিয়ে আয়, আয় বলছি, নিচে নেমে আয়।শিবের থানে ভর করেছিস? আজই তোর খেলা শেষ।
তান্ত্রিকবাবা কাপালীমন্ত্র বলতে শুরু করে।

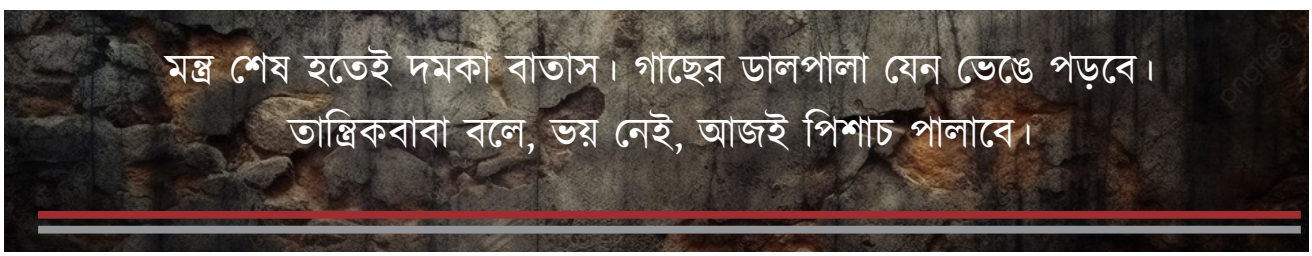

সবাই নিস্তব্দ। শুধু বটের শাখায় বাদুড়ের ডানা ঝাপটানো আর চিঁচি শব্দ।
এর মধ্যে কালীবাড়ির পুরোহিত শ্রীদাম এসে বসে। খুব আগ্রহে বাবাকে দেখে। বাবার কথা শোনে। ও পাঠ নিতে চেষ্টা করে। তাই তান্ত্রিক চোখ খুলতেই পুরোহিত জিজ্ঞেস করে, বাবা বাণেশ্বর শিবলিঙ্গে দশোপচার পূজার মন্ত্রটা যদি একটু বলেন। ভীষণ কঠিন। আমি এখনও উদ্ধার করতে পারিনি।
গন্ডকীবাবা দুহাত আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে, জয় বাণেশ্বর বাবার জয়। হে মানব শোন তবে...
ঐঁ এতৎ পাদ্যং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ এষঃ অর্ঘ্যঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদমাচমনীয়ং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং স্নানীয়ং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ এষ গন্ধঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং বাণেশ্বরশিবায় নমঃ।
সঙ্গেসঙ্গে শঙ্খ উলুধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে। কী ভয়ংকর সেই মন্ত্রের নিনাদ, তার তেজ!...
নমস্তে রুদ্রমণ্যব অতি–তা ইসাভে নমঃ |
বহুভ্যো মাতু–তে নমঃ ||
ওম হাম হাম সত্রস্তম্ভনায় হাম হাম ওম ফুট |
মন্ত্র শেষ হতেই দমকা বাতাস। গাছের ডালপালা যেন ভেঙে পড়বে। তান্ত্রিকবাবা বলে, ভয় নেই, আজই পিশাচ পালাবে। তারপর দুহাত তুলে বাবা উপরে তাকায়। একটা বিরাট আকারের বাদুড় ঘুরতে ঘুরতে তান্ত্রিকের হাতে। তান্ত্রিকবাবা মুহূর্তে দুহাতে ডানা ধরে নিমেষে বাদুড়ের গলা ছিঁড়ে ফেলে। বাদুড় ছটফট্ করছে। বাবা মুন্ডু ধরে একঝটকায় সামনের আগুনে নিক্ষেপ করে। সকলে বিস্ময়ে হতবাক। ভয়েতে চোখ বন্ধ করে।
তান্ত্রিকবাবা আগুন থেকে একমুঠো ছাই নিয়ে আকাশে মিলিয়ে দেয়। হাত জোড় করে মহাকালের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। তীক্ষ্ণ গলায় উচ্চারণ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

করে,
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্তং পরমেশ্বরম্।

পর্ব ৫

আজ সকাল থেকেই কালিয়াগড় গ্রামে আকাশে-বাতাসে রটে যায়, ভয়ংকর বাদুড় পিশাচ মুক্ত হয়েছে শিবের থানে। কিন্তু তান্ত্রিকবাবা কোথায় গেলেন? ভোর থেকেই কানাঘুষো খবর পেয়ে জড়ো হয়েছে বটের তলায়। দুয়েকজন টিনের দরজায় টোকা মেরেছে। কিন্তু ডাকতে সাহস পায়নি।
খবর পেয়েই অভয়জ্যাঠা, সতীশকাকা, গুপী, নিতাই,সকলেই হাজির। একটু পরেই হাজির হয় গ্রামের মাতব্বর মুক্তেশ্বর দাস। কথাবার্তা চলছে। ভিতরে বাবা আছে কি নেই, সেটাই বুঝতে পারছে না।
হঠাৎ বাংশীর মা জানায় কাল অনেক রাত্রে একজনকে ওই ঘরে ঢুকতে দেখেছে। কিন্তু তান্ত্রিকবাবা নয়। চুল-দাড়ি কাটা সাদা ধুতি পরা কোনও পুরোহিত হবে।
- এই মরেছে। কি কস তুই? এহানে নেশার আড্ডা হইত নাকি? আলোকাকির কথায় রমলামাসি বলে, হইতেই পারে। তান্ত্রিকদের আখড়ায় গাঁজা মদ চরস থাকবেই।ওদের কারণ হল মহাপ্রসাদ।
- আরে তোমরা থামবে? আমরা তো বুঝতেই পারছি না, তান্ত্রিকবাবা ভিতরে আছে নাকি উধাও হয়েছে? সতীশকাকার কথায় গুপী বলে, কাকা, তাহলে, কালো ত্রিপল, টিন খোলা হোক। বেটা মরে গেছে কিনা কে জানে?
ধীরে ধীরে গ্রাম ভেঙে লোক আসে বটের থানে। মানুষের মুখ আটকানো যাচ্ছে না । কেউ বলছে ভণ্ড, কেউ বলছে সাত্ত্বিক, কেউ বলছে কালাজাদুর তান্ত্রিক...
অবশেষে অঞ্চলপ্রধান তিনকড়ি দাস এলেন। পদ্মদিঘির পাড়ে তখন হাজার মানুষের ভিড়। বাড়ির কাজকর্ম ফেলে বউ-ঝিরা সবাই কোলের বাচ্চা নিয়ে তান্ত্রিকের খোঁজে এসেছে। তাদের এই ক'দিনে ভালোলাগা, ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মেছে।
তিনকড়িবাবুর জন্য চেয়ার এল। গ্রামের মাতব্বররা সকলেই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে।
- সতীশদা, অভয়দা, কি চাও তোমরা? পুলিশ ডেকে তাদের হাতে কেসটা ছেড়ে দেবে? নাকি বিষয়টা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে?
কথাটা তিনকড়ি কানে কানে ভাসিয়ে দিলেন।
- গুপী প্রথমেই বলে, ব্যাপারটা পুলিশে দেওয়া হোক।
অভয়জ্যাঠা টিপ্পনী কাটে, গ্রামের ব্যাপার, পুলিশ ডাকলে সেটাকি ঠিক হবে?
নিতাই গলা বাড়িয়ে বলে, বাবা তান্ত্রিক মানুষ, ভিতরে মদ গাঁজা কি কি খেত, কে জানে। বেটা শয়তানের গাছ। আবার লোকজন আসত বলছে। পাশ থেকে আলোকাকি হুংকার দেয়, তুই খামোকা লোকটাকে মন্দ বলিস কেন? তোরা যখন রাতদুপুরে মদ গিলিস, বেলেল্লাপনা করিস, সেকালে দোষ নেই?
কথা শেষ না হতেই নিস্তারিণী ঘাড় বেঁকিয়ে সামনে মুখ এনে বলে, তোরা যে ঝগড়া করছিস, আগে দরজা সরিয়ে টিন খুলে দেখ, লোকটা মরল না অসুখ করল...
তিনকড়ি নড়ে বসে, ঠিক বলেছো মাসি, এই গুপী, আগে দরজা খোল, টিনের বেড়া সরা, সব দেখে তারপর সিদ্ধান্ত।
গুপী, নিতাই, শিবু, পলাশ সকলে দরজায়

আবার লোকজন আসত বলছে। পাশ থেকে আলোকাকি হুংকার দেয়, তুই খামোকা লোকটাকে মন্দ বলিস কেন?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

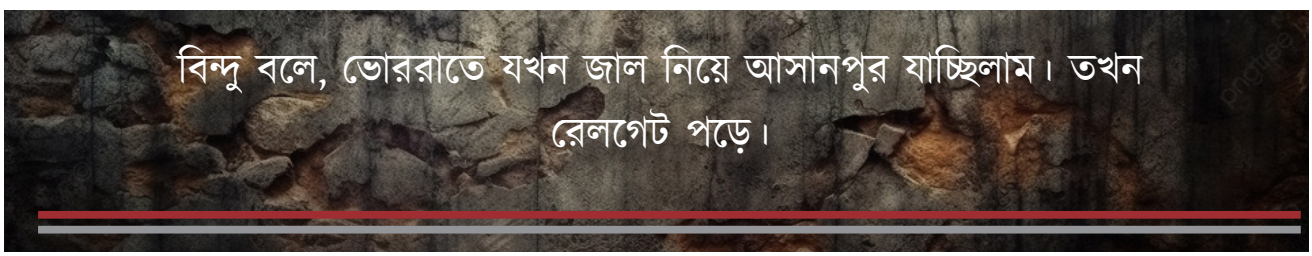

ডাকাডাকি, টানাটানি করে। কিন্তু ভিতর থেকে সাড়া নেই।
- কাকা, ভিতর থেকে তালা বন্ধ , কি করব?
পলাশ বলে, দুদিন বাদেই গাজন, থান পরিষ্কার করতে হবে, ভেঙে ফেলাই ভালো।
অবশেষে কুড়ুল, হাতুড়ি, বাটালি এনে দরজা ভাঙা হয়। কালো ত্রিপল সরিয়ে পাশ থেকে ঘেরাটিন খোলা হয়। কিন্তু সকলে ভিতর দেখে দুহাত কপালে তুলে প্রণাম করে। আলোকাকি জয়ধ্বনি দেয়, জয় বাবা মহেশ্বরের জয়, জয় কৈলাসপতির জয়।
সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। হুমড়ি খেয়ে দেখতে যায়। একী! ভাঙা বেল গাছের গুঁড়ি নেই, দাঁড়িয়ে আছে শিব শম্ভু দেবাদিদেব মহাদেব। এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অজগর, কাঠ খোদাই অপূর্ব মূর্তি। সঙ্গেসঙ্গে শ্রীদামকে ডাকা হয়। ব্যানার্জিদিদা চলে আসে। এক ঘড়া দুধ দিয়ে বাবাকে স্নান করানো, আসন শুদ্ধি, মেয়ে-বউরা ভগবান শিবের মূর্তি দেখে আবেগে আপ্লুত।
পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে।
ওদিকে ছেলেরা টিন ত্রিপল নোংরা জঞ্জাল সরিয়ে পুকুরের জল দিয়ে মণ্ডপ সাফা করছে।
হঠাৎ বেনুপিসি বটের থানে এসে আছাড়িপিছাড়ি খায়। ওলো সব্বনাশ হয়ে গেছে, ও মাগো আমার গৌরী কোথায় গেলো গো, ও ভগবান, মেয়েটাকে কেড়ে নিলো গো...
সবাই শিবঠাকুর ফেলে বেণুপিসিকে ধরে। চোখে-মুখে জল দেয়। শান্ত করে।
অভয়জ্যাঠা জিজ্ঞেস করে, গৌরীকে পাওয়া যাচ্ছে না? হয়তো আশপাশে কোথাও গেছে।
- না গো দাদা,ভোরকাল থেকে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও নেই। আমার কি হল গো, ও গৌরী কোথায় গেলিরে? বলে বেণুপিসি থানে মাথা ঠুকতে থাকে। সবাই জাপটে ধরে।
ভিতর থেকে গুপী চেঁচায়,দাদা, এই দেখো, একটা প্যাকেটে জটা চুল, দাড়ি, কালো কাপড়, কলকে, তান্ত্রিক ফেলে গেছে ।
- তাহলে মনে হচ্ছে, দুটো মিসিং-এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে। সতীশকাকা বলে।
-এদিকে তান্ত্রিক বেপাত্তা। গৌরীও নেই। পুলিশ ডাকতেই হবে । গুপীর কথায় সকলে যখন সম্মতি দেয়, তখনই বিন্দু জালের হাঁড়ি জাল নিয়ে ভ্যানে করে ঢোকে।
পলাশ, বলাই, উত্তম সকলে বিন্দুকে তিনকড়িবাবুর সামনে আনে।

বিন্দু বলে, ভোররাতে যখন জাল নিয়ে আসানপুর যাচ্ছিলাম। তখন রেলগেট পড়ে।

- কাকা, বিন্দু বলছে তান্ত্রিককে দেখেছে , শোনো ওর মুখে।
সবাই চুপ হয়।
বিন্দু বলে, ভোররাতে যখন জাল নিয়ে আসানপুর যাচ্ছিলাম। তখন রেলগেট পড়ে। হঠাৎ দূরে দেখি সাদা ধুতি পরা নেড়ামাথা একজন দুনম্বর প্ল্যাটফর্মে উঠছে। ঠিক সেইসময় নবদ্বীপ লোকাল আনাউন্স করে।
সঙ্গেসঙ্গে বেণুপিসি হুড়মুড় করে মাটি থেকে উঠে বলে, এই বিন্দু, সঙ্গে গৌরী ছিল?
বিন্দু একবারটি তাকিয়ে বলে, পিছনে এক মহিলা শাড়ি পরা ছিল। কিন্তু অন্ধকারে ঠাওর করতে পারিনি।
শ্রীদাম পুরোহিত বলে ওঠে, ও কাকা, তান্ত্রিক গৌরীকে পেয়ে গৃহী হয়ে গেল নাকি?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মনে মন্ত্র, তনুতে তন্ত্র

সুবীর মুখোপাধ্যায়

আগুনের শিখা উজ্জ্বল কমলাবর্ণের হয়ে উঠছে অনেক উঁচুতে। সঙ্গেসঙ্গেই যাঁরা দূরে বসে আছেন তাঁরা সমবেত স্বরে চীৎকার করে চলেছেন, "জয় মা, জয় মা," বেশি উৎসাহিতরা বলছেন—"জয় মা চণ্ডী, জয় মা তারা, জয় রুদ্র চণ্ডী"। শুনছেন সবই তান্ত্রিক মহারাজ স্বামী দিব্যানন্দ। রক্তবস্ত্র পরিহিত দিব্যানন্দ, অগ্নিতে দিলেন কারণ, শিখা উঠছে আরও উপরে।

দিব্যানন্দ এবার বলেন— এখানে উপস্থিত যাঁরা আছেন সবাই হাত খুলে রাখুন। মুঠো করে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রাখবেন না। ডাকলেন শিষ্য কালাকে, বললেন— সবাইকে প্রসাদ দাও, অর্থাৎ কারণ বিতরণ করো। সকলেই যেন রক্ততিলক কপালে পরে।

যজ্ঞ তখনও থামেনি, চলছে।

যাঁরা এর আগে এসেছেন, তাঁরা বলছেন, "সারা রাতই পূজা হবে, এর পরে হবে বিশেষ পূজা।"

আমি নতুন তাই সব জানলাম। সাময়িক বিরতিতে সামনেই চলে গেলাম তান্ত্রিক দিব্যানন্দের কাছে, যেতেই সহাস্যে বললেন□কেন কষ্ট পাচ্ছ? তোমার তো ডাইনে-বাঁয়ে কেউ নেই? তুমি তো মুক্তপুরুষ, সাধনায় লিপ্ত হও।

আমি অবাক দৃষ্টিতে বললাম— মহারাজ, চিন্তামুক্ত হতে পারছি কোথায়? জীবনটা আছে।

—আছে, ওই জীবনটাই মাতৃচরণে নিবেদিত কর।

সম্ভবত শোল মাছ পোড়া সামনে দিয়ে চলে এল। নিমেষে কালো পাথরের থালা কোথায় উধাও হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরেই ধোঁয়ার মধ্যেই দেখা গেল ওই থালাটা খালি।

কী হল এইসব? কোথায় গেল? যজ্ঞের আগুনের তেজ বেড়েছে, সঙ্গে হচ্ছে প্রচুর ধোঁয়া, এত ধোঁয়াতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যে শোনা গেল নূপুরের ধ্বনি। কে যেন যজ্ঞকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে আবার দেখা গেল অনেকটা উপরে, যেন হাওয়ায় দাঁড়িয়ে। কী করে সম্ভব এসব!

কে দাঁড়িয়ে? মনে হল করালবদনী দেবী মূর্তি, হাতে রুধির পাত্র, সেটাও উধাও হয়ে গেল, আবার ওই পাত্রেই কে যেন ঢেলে দিল কারণ। স্পষ্ট

> সবাই বিস্ময়ের ঘোরে।
> সবাই চলে গেলেও, আমাকে বসিয়ে রাখলেন মহারাজ।

কিসের দ্বিধা? বলেই আমার মাথায় হাত দিয়ে উচ্চারণ করলেন— "মানসে দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়েণী হয়।

অমরো ভৈরব স্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক।"

তার পরেই আমি অচৈতন্য হয়ে পাশেই পড়ে গেলাম। মনে হল যেন আমি হাওয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছি, দূরে মেঘের আড়ালে রয়েছেন উগ্রতারা, ব্যঘ্রচর্ম পরিহিতা সর্পালংকারে ভূষিতা, জানি না কতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিলাম, উঠে বসতেই মন্ত্র উচ্চারণ থামিয়ে বললেন-- "বৎস, যা দেখেছ, প্রকাশ করবে না, ওটা একান্ত নিজস্ব, এবার আমার সঙ্গে বলো— 'কালী, কালী মহাকালী, ওঁ ওঁ, অঞ্জনাদ্রি নিভাং দেবীং শ্মশানিলয় বাসিনীম, নগ্নাং, মত্তা সদাসবৈঃ।"

যা দেখলাম, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। দেখলাম— দূরে এলোকেশী এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, জিহ্বা অনেকটাই বেরিয়ে, আবার ঢুকে গেছে কালো পাথরের থালায় কিছু মাছ দেখলাম, ওই কালো কুঞ্চিত কেশবতী মহিলা মদ্যপান করছেন। যেন চক্ষু দিয়ে আসছে তীব্র জ্যোতি, আমি তখন আমিতেই নেই। যেন অসাড়, স্থবির বস্তুর মতো।

বেশ কিছুক্ষণ পর, সকলের সঙ্গেই আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। সবাই বিস্ময়ের ঘোরে। সবাই চলে গেলেও, আমাকে বসিয়ে রাখলেন মহারাজ। কাছে ডেকে বললেন— দেখো, আঁধার ভালো না হলে, শাস্ত্রের জ্ঞান দেওয়া নিরর্থক। তুমি ভালো আঁধার, শনির জাতক, আধ্যাত্মিকতার প্রভাব আছে, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রতেই বলা আছে "অথ অতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"

-এর মানে কি?

—চূড়ান্ত সত্যকে জানার ইচ্ছা এখনই? অধ্যাত্ম উন্নতির ক্ষেত্রে কোনও নির্ধারিত সময়সীমা নাই। অথ মানে এখনই, সেই এখন বিভিন্ন মানুষেরে জন্য বিভিন্ন, যখনই চরম সত্যকে জানার ইচ্ছা জাগবে। তখনই জানবে সময় হয়েছে তাঁকে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জানার, আধ্যাত্মতাকে উপলব্ধি করার। আজ তোমাকে এখনই নিয়ে যাব একটা গুহায়। নীল পর্বতের ওই গুহাতে গিয়ে দেখতে পাবে তাঁকে।
—তাহলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিই।
—কোনও প্রয়োজন নেই, চলো, সব হয়ে যাবে।
চলেছি পদব্রজে নীল পর্বতের অজানা গুহায়, না-আছে স্নানের ঠিক, না-আছে দুপুরের খাওয়ার ঠিক। মনে মনে ভাবছি একি জ্বালায় পড়লাম। আমার দিকে ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকালেন তান্ত্রিক, কিছুক্ষণ বাদেই চমকে গেলাম সূর্যের আলোর মধ্যেই, ঝেঁপে এল বৃষ্টি। অবগাহন হল দু'জনেরই, একটু দূরে দাঁড়িয়ে তান্ত্রিক হাসছেন। আবার রৌদ্রে, চলছি। তৃষ্ণার্ত হয়েছি, কষ্টও হচ্ছে, কিছু বলতে পারছি না, এমন সময় একজন বিকট

দর্শনা করালবদনী মাতৃমূর্তি, সঙ্গে তাঁরই ভৈরব। আশ্চর্য এই নির্জন স্থানে কে যেন পূজা করে গেছে, জ্বলছে প্রদীপ, যজ্ঞের কুণ্ড থেকে উঠছে ধোঁয়া। আমি ঘোর বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি— প্রভু, এখানে নিত্য সেবা হয়? পূজা হয় দেখছি, কোনও মানুষকে দেখছি না তো?
-সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে কি সবকিছু প্রত্যক্ষ করা যায়? কাছে এসো। তারপর মাথায় হাত রেখে বললেন, এবার অবলোকন করো— চোখ বন্ধ করে দেখছি, পূজা করছেন সাধ্বী, সাধকরা, সঙ্গে আছেন কয়েকজন উলঙ্গ সাধু। কিছুক্ষণ বাদেই মাথা থেকে হাত সরিয়ে বললেন, এবার বুঝেছ?
—দেখেছি, কিন্তু বুঝিনি, তাঁরা কোথায় এখন ?
—সময়ে সব বুঝবে, অর্ন্তদৃষ্টিতে সবই দর্শন সম্ভব,

এত বিস্ময়, এত আশ্চর্য ঘটনায় আমি রীতিমত হতবাক, শুধু বললাম— এরা জীবিত প্রভু?

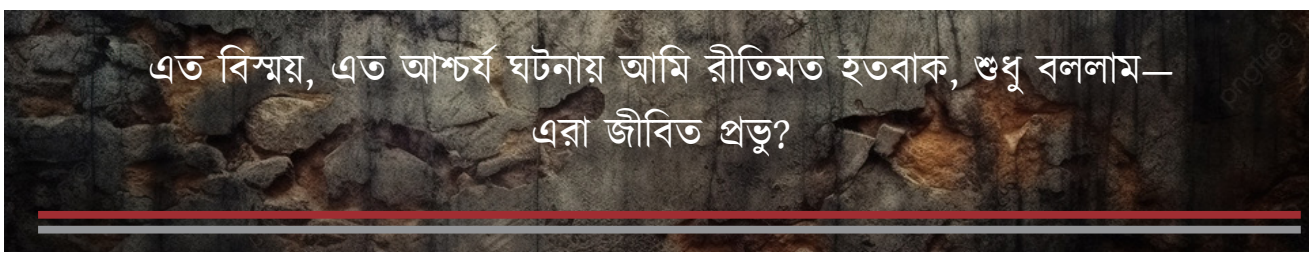

দর্শন, কুৎসিত মানুষ এসে আমার সামনে রাখেন একটা মাটির কলসি। ভাবলাম জল পেলাম। মাটির কলসিটা হাতে নিতেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওই মানুষটি।
তান্ত্রিক এসে বললেন নাও, গলা ভিজিয়ে নাও, আমিও পান করি। কিন্তু কাপ নাই, গ্লাস নাই, কীভাবে পান করা হবে? দমকা হাওয়া হল, চোখ বন্ধ করলাম, আবার হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, চোখের সামনে রয়েছে থালায় বিস্কুট আর দুটি মাটির গ্লাস।— চিন্তা কেন করিস রে পাগল?
আমি চা বিস্কুট দিলাম। নিজেও খেলাম, এ তো চা নয়, যেন অমৃত-সুধা। চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞেস করি— প্রভু আপনি কে?
—ভ্রান্তি দূর করো। আমি তোমার মতোই একজন মানুষ, চলো।
অবশেষে দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম একটা গুহাতে। সামনেই রয়েছে ভীষণ

তবে যাদের দেখেছ, তারা সবাই ইচ্ছাধারী, যে-কোনও রূপ যখন-তখন ধরতে পারে। অনেক উচ্চমার্গের সাধক, সাধিকা এরা। এত বিস্ময়, এত আশ্চর্য ঘটনায় আমি রীতিমত হতবাক, শুধু বললাম— এরা জীবিত প্রভু?
—এরা সকলেই পাঁচশত বছর ধরেই জীবিত। মরণ এদের স্পর্শ করতে পারবে না। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় মহাকালের আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তোমার ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব হবে, করতে হবে ধ্যান, জপাৎসিদ্ধ হতে হবে। এখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। শোনো এই যে গণ্ডি কেটে দিলাম, এর বাইরে যাবে না। আমি এখন জপে, তপে বসব।
--প্রভু যদি বাথরুমে যেতে হয় ?
—এখনই সেরে এসো, তবে ওই গণ্ডির মধ্যে থাকাকালীন তোমার এসব বোধ হবে না। বলেই তান্ত্রিকবাবা ত্রিশূল দিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে চারিদিক গোল করে দণ্ডি কাটলেন। আমাকে ওর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মধ্যে বসিয়ে মাথায় জপ করে বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়তে লাগলেন। আমাকে একটা বীজ মন্ত্র দিয়ে বললেন, জপ করে যাও, থামবে না। মন্ত্র পড়তে লাগলেন উপরে হাত বাড়ালেন, হাতে এসে গেল একটা মাটির হাঁড়ি, আমাকে দিয়ে বললেন—"এতেই দ্বি-প্রাহরিক আহার হয়ে যাবে।" সঙ্গে এক কলসি পানীয় জল। এসো, এই আসনে বোসো, আসন শুদ্ধি করো, দেহ শুদ্ধি করো, এসব তোমার জানা আছে, নির্দেশমতো করলাম। বললেন— খেয়ে নিয়ে জপে বসে কোনও প্রলোভনেই এই গণ্ডির বাইরে যাবে না। এখানে যক্ষ, যক্ষিণী, পরি, যোগিনী আসতে পারে, নিশ্চিন্তে থাকো। কেউ গণ্ডির ভিতরে ঢুকবে না। কোনওকিছুই করতে পারবে না। প্রলোভন জয় করাই, প্রকৃত সাধনার অঙ্গ। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই, দেবো প্রকৃত সুখের সন্ধান, মনে রেখো আমার জপ, তপ, সাধনার শেষে, আমিই আবার তোমার কাছে আসব। অমোঘ নির্দেশমতো পালনীয় কর্তব্য করে চলেছি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, মিলল চাঁদের দেখা, আমি জপ করে চলেছি, হঠাৎই বেজে উঠল, কাঁসর, ঘণ্টা, জ্বলে উঠল প্রদীপ, ধূমায়িত হল যজ্ঞকুণ্ড। অথচ কে এসব করছে, চারিদিক এতই ধূমায়িত যে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। শুধু শব্দ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে মন্ত্রোচ্চারণ। ধোঁয়ার মধ্যে আবছা দেখা গেল একজন জটাধারী সাধু আরতি করছে, সঙ্গে সহযোগিতায় এক সুন্দরী সাধিকা। ঢাকের শব্দ, শঙ্খধ্বনি, সব বন্ধ হয়ে গেল। ওরা যেন নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এ যেন ভোজবাজি, ম্যাজিক, যাইহোক আমি আবার জপে মন সংযোগ করলাম।

কিছুক্ষণ কেটে গেল গভীর নিস্তব্ধতায়। তারপর হল খেলা শুরু। বিরাট বড় একটি কালো ভাল্লুক গুহার মধ্যে ঢুকেছে, আমি দেখছি, দাঁত, মুখ খিঁচিয়ে আক্রমণ করতে আসছে, কিন্তু গণ্ডির বাইরেই হচ্ছে এসব। একবার চেষ্টা করতেই আগুন জ্বলে ওঠে। জটা পিছিয়ে গেল। বাবা মন্ত্রের কি শক্তি? মনে পড়ছে বাবা বলেছেন, "তন্যতে বিস্তারিয়তে জ্ঞানম্, অনেম ইতি তন্ত্রম্" মনে হচ্ছে, যে-জ্ঞান বিস্তারিত হয়ে তারণ(এ) করে তাকেই বলা হয় তন্ত্র, যা আবার তনুর সঙ্গেই বিশেষ সম্পর্কিত। এই সাধনায় ইন্দ্রিয় জয় হয়, এটা কখনোই ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার সাধনা হতে পারে না। মূলকথা অন্তরের শক্তিকে (কুণ্ডলিনী) জাগরিত করলেই অন্য জগতের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এখানেই প্রণম্য আধ্যাত্মিক বিশ্ব কবির উক্তি।

আছি আসলে অন্য ঘোরের মধ্যে।
কিছুক্ষণ পর শুনি নূপুরের ধ্বনি, ছম্ ছম্।

'বুকের ভিতর বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'। এখানে কে এই বিশ্বলোক? এটাই অনন্ত জিজ্ঞাসা। তন্ত্র ক্রিয়াশীল তনুতে, মন্ত্র যথেষ্ট ক্রিয়াশীল মননে। দেহ শুদ্ধ প্রশান্ত থাকলেই, মন্ত্র উচ্চারণ সার্থক হবে, পাওয়া যাবে আকাঙ্ক্ষিত ফল। আছি আসলে অন্য ঘোরের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর শুনি নূপুরের ধ্বনি, ছম্ ছম্। চোখ খুলেই দেখি এক রূপসী সুন্দরী, নৃত্যরতা, একি? এখানে কিভাবে এলেন এই রূপসী অসামান্যা সুন্দরী। দুলছে মেঘবরণ কেশরাজি, উদ্ধত স্তনযুগল, বেশ মোহময়ী, আকর্ষণীয়, চোখের ভাষায় নিকটবর্তী হতে আহ্বান করে চলেছে। এটাই প্রলোভন? তাহলে নিজেকে সতর্ক থাকতেই হবে। বেশ কিছুক্ষণ পরেই ঘটল অতি অলৌকিক কাণ্ড, নৃত্যারতা মহিলার জায়গায় দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় এক গোখরো সাপ আক্রমণে উদ্যত। কিন্তু গণ্ডি পেরোতে পারছে না। প্রশ্ন করি, কে এই ইচ্ছাধারী নাগিন? কেন সে এখানে? ভয় পাচ্ছি। কিন্তু, গায়ত্রী করে যাচ্ছি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আবার জপ করছি ক্রীং হুং ক্রীং কালাকাটেয় স্বহা। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ, বোধহয় কেউ নিশ্চয়ই আড়াল থেকে সব লক্ষ রাখছেন নইলে মাথার পিছন থেকে এল দুটো জলের পাত্র । জল পান করলাম। তারপর দেখছি সুন্দর দুটো পরি ডানা মেলে গণ্ডির বাইরে বসেছে। কি তাদের রূপ, বেশ মোহময়ী তারা হীরা, জহরৎ, মনি মুক্তায় সজ্জিতা। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। তবুও দেখছি, তার পিছনে গুহার মধ্যে লাল, নীল, সবুজ, কমলা রংয়ের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, দূরে আবছা আলোয় দেখছি কারা যেন নাচছে, দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই। নিদ্রাই আমাকে সেইসময় বাঁচিয়েছে।

সকালেই দিব্যানন্দজি এসেছেন, "কেমন কেটেছে কাল।" আমি সোজা পায়ে পড়ে বলি। "প্রভু আপনি সত্যই কে?"

হাসিমুখে বললেন— কেন? আমি তোমার মতোই একজন সামান্য মানুষ। আমি যা জানি, সেটা জানাতেই একজন ভালো আধার খুঁজছি।

আপনি বোধহয় তান্ত্রিক।

—আমি আমিই, একজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী।

—না, আপনি তন্ত্রসিদ্ধ, পিশাচসিদ্ধ, আপনি কি অঘোরী তান্ত্রিক?

স্মিত হেসে বললেন—The best thing can't be told, the second best are misunderstood.

অবাক বিস্ময়ে বলি— আপনি তো ইংরাজিও জানেন—আত্মপ্রচার অহংভাবকে বৃদ্ধি করে, তবুও তোমার কৌতূহল মেটাতে বলি আমি ইংরাজিতে M.A. এবং Economics-এ M.A.

প্রশ্ন উঠবে ,আমি কেন নির্জনে, পাহাড়ের গুহায়? কুল কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে, অনেককিছুই জানা যায়। যেমন জানা যায়, বহির্জগৎ অর্থাৎ বাস্তব জগৎটাই সব নয়। একমাত্র সত্য নয়। আরও আছে, যথার্থ সত্য রয়েছে অন্যত্র। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে বিশেষভাবে জানতে, তন্ত্র জানতে হবে তার প্রয়োগ। মন্ত্র, তন্ত্র শব্দ দুটির মধ্যে 'এ' আছে। যার প্রকৃত অর্থ তারণ, এরই মাধ্যমে ত্রাণ বা উদ্ধারের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্ত্র অনেক প্রকার যেমন মন্ত্র সাধনা, শবসাধনা, যন্ত্র সাধনা, ভৈরবী সাধনা— এসবই পথিক তন্ত্র। সেটা হল যোগ। কুণ্ডলিনী যোগ, পঞ্চ 'ম'কার সাধনা স্থূল সাধনা, ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার সাধনা।

—কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করাই তো আসল সাধনা।

—চমৎকার বোধবুদ্ধি আছে, আগেই বলেছি তুমি আধার ভালো, আমার দৃষ্টি ভুল করে না।

— গুরুদেব, অঘোরীতান্ত্রিক কারা?

তুমি বললে গুরু, কে গুরু? গুরু কথার অর্থ কি? 'গু' মানে অন্ধকার, 'রু' মানে আলো, জ্ঞানের আলো। তাহলে দাঁড়াল এই যে যিনি প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত।

—তুমি বললে গুরু, কে গুরু? গুরু কথার অর্থ কি? 'গু' মানে অন্ধকার, 'রু' মানে আলো, জ্ঞানের আলো। তাহলে দাঁড়াল এই যে যিনি প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত। তিনিই অজ্ঞানতার তিমির নাশ করে শিষ্যকে জ্ঞানের আলোর জগতে নিয়ে চলেন, সেইজন্য বলা হয়েছে "গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর; গুরু রেব পরং ব্রহ্ম।"

—জানি গুরুই পরম ব্রহ্ম।

–তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, অঘোর মন্ত্রের উপরে আর কোনও মন্ত্র নাই, অঘোরী অর্থ যার ঘোর কেটে গিয়েছে, তাঁদের আরাধ্যা দেবীর নাম শ্মশান তারা তারা শব্দের অর্থ যিনি তারণ করেন। শ্মশানেই সর্বনাশ হয়। অঘোরীরা শ্মশানেই পূজা করেন মায়ের। আকুলভাবে মাকে ডাকো, তাঁর সাড়া পাবেই, তবে ছাড়তে হবে আমিত্ব, ভাবতে হবে সবই তোমাতে। এই যে দেহ বিশ্ব এটা তো তাঁরই দান, এই মধ্যেই আছে কুল

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কুণ্ডলিনী, যা থাকে সুপ্ত নিদ্রিত। তাকে জাগ্রত করতে হয় সাধনার দ্বারা। দেহে আছে ৫১টি স্তর, আবার মহামায়ারও রয়েছে ৫১টি পীঠ। মাতেই সব, মাতেই সৃষ্টি, আবার মাতেই শেষ, সেখানেও বিরাজমান শ্মশানকালী।

আমিই যখন বর্তমান থেকে কালে রূপান্তরিত, তখনও কালী, আবার কালীর পদতলেও মহাকাল। অর্থাৎ সর্বত্রই মাতৃময়। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম, বুঝলাম এ এক অনন্ত জিজ্ঞাসা, যেন নদীর প্রবাহ, শেষ হয়েছে সাগরে, যার তল খুঁজে পাওয়াই কঠিনতর।

অবাক বিস্ময়ে আমি শুধু বাবাকে দেখছি। সম্বিৎ ফিরল তান্ত্রিকের ডাকে, "ভাবনার কি আছে তোমার, সব ভাবনাই তাঁর। এখন কিছু আহার করো। বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র বললেন। হাত উপরে তুলতেই হাঁড়ি এসে গেল। সুগন্ধযুক্ত খাবার এসে গেল। কে দিল। কে দিচ্ছে, ভাবনার নেই, খেয়েই যাচ্ছি। বুঝতে পারছি না এই অলৌকিক খেলা, যদিও মানুষটাই সম্পূর্ণ লৌকিক। কাল আবার অমাবস্যার বিশেষ পূজা, এটা ফলহারিণী কালীপূজা। কালাকে ডেকে কালকের পূজার দ্রব্যগুলি জোগাড় করতে বললেন।

—প্রভু, অনেকেই কালকের পূজায় আসতে চাইছে।

—না, বেশি লোক ডাকা যাবে না, কোনও মহিলা যেন না আসে।

—প্রভু, ভৈরবীরা আসবেন তো?

—ওঁরা তো আসবেনই। যাঁরা আসবেন, তাঁদেরকে কারণ আনতে বলবে।

মহাপূজা শুরু হয়েছে। কালা এসে প্রত্যেককে খানিকটা মুড়ি, ছোলাসিদ্ধ দিয়ে গেল, সঙ্গে মাটির গ্লাস। প্রসাদী কারণ এসে গেছে, সবাই ঢেলে নিচ্ছে, আমিও নিলাম। বসেছি বাবার কাছেই। অগ্নিকুণ্ডে চলছে আহুতি প্রদান, মন্ত্র, উচ্চারণ হচ্ছে, চলছে তন্ত্রের ক্রিয়া। পূজা হচ্ছে চৌষট্টি যোগিনীর পূজা। তারপর হবে যক্ষ, যক্ষিণীদের সন্তুষ্টিকরণ। রাত বাড়ছে, অগ্নির শিখাও হচ্ছে উচ্চতর। কিছুটা দূরেই দেখা গেল অদ্ভুত দর্শন পিশাচ-পিশাচীদের সঙ্গে ভূত, প্রেত, পেতনি, তারা কান্নার সুরে বলছে, "আমাদের কি হবে?"

তান্ত্রিকবাবা হুংকার দিয়ে বলছেন— বজ্জাতের দল, যাবি নাকি মন্ত্রবলে সব শেষ করে দেব। বলেই খানিকটা সাদা সরিষা নিয়ে মন্ত্র পড়ে দূরে ছুড়ে মারতেই, চীৎকার, "ওরে বাবারে, মারা গেলাম, কি যন্ত্রণা, কি যন্ত্রণা।" এবার নাকি কান্নায় বলে, -কিছু দিবি তো?

মনে হল যেন ওরা চলে গেল। আমি ভয়ে নিজের গায়েই চিমটি কেটে দেখছি, আমি অসাড়ে নেই তো ? যজ্ঞকুণ্ডের শিখার মধ্যেই এবার দেখে চমকে গেলাম।

বাবার ইশারায় এক থালা চাল, কলা, গুড়, কালো তিল সামনে দেওয়া হয়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সব শেষ, তবে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। সব দেখে বাবা বলে— এবার যা, এখুনি যা। একটা দমকা হাওয়ার স্রোত বয়ে গেল। মনে হল যেন ওরা চলে গেল। আমি ভয়ে নিজের গায়েই চিমটি কেটে দেখছি, আমি অসাড়ে নেই তো ? যজ্ঞকুণ্ডের শিখার মধ্যেই এবার দেখে চমকে গেলাম। অগ্নির মাঝেই, দেখা গেল এ দেবীকে, এলোকেশী, বরাভয়দাত্রী, খুবই সুন্দর, বিরল দৃশ্য, আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম। ইশারায় বাবার কাছে ডেকে নিয়ে হাতে দিলেন একটি লাল চন্দন মাখানো পদ্ম, মন্ত্র উচ্চারণ করালেন, বললেন— চোখ বন্ধ করে, ফুলটি নিয়ে দুই হাত জোড়া করে দাঁড়াও।

চোখ বন্ধ অবস্থায় কে যেন আমার হাতে স্পর্শ করল। অতি শীতল স্পর্শ মন্ত্র উচ্চারণ শেষে বাবা বললেন—"এবার চোখ খোলো।" দেখলাম, হাতের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফুলটি ওই দেবীর হাতে। এর থেকে অতি আশ্চর্য আর কি হতে পারে?

আমার দিকে তাকিয়ে বাবা স্মিত হাসলেন। ইশারায় মুখ বন্ধ রাখতে বললেন। এরপর সাময়িক বিরতির শেষে বিশেষ ভোগ নিবেদন হবে।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছে। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন? বুঝলাম, এরা কিছুই দেখতে পায়নি, উত্তরে বলি, শুধু মাকেই দেখছিলাম প্রাণ ভরে।

তান্ত্রিক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "পূজা হবে এবার দশ মহাবিদ্যার। মায়ের দশটি বিশেষ রূপ। মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী, কমলা। এর মধ্যে গৃহীদের জন্য হবে মা কালীর পূজা। এর মধ্যে সবথেকে কঠিন পূজা তিনটি। বগলা, ধূমাবতী এবং ছিন্নমস্তা। এঁদের মন্ত্র শুনো, তবে উচ্চারণ করবে না। বগলার মন্ত্র, "ওঁ হ্রীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং, বাচং মুখং স্তভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা।" ধূমাবতীর মন্ত্র, সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ, "ওঁ ধূং ধূং ধূমাবতী স্বাহা।" ছিন্নমস্তা, দেবী উগ্র চণ্ডিকার মতো, তবে বিশেষ করুণাময়ী, নিজের রক্ত সন্তানদের পান করিয়েছেন। উচ্চমার্গের সাধাকরাই এই দেবীর পূজা করেন— "ক্লীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্র বৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।" এছাড়া শাক্তমতে দেবীর নবরাত্রি পূজা হয়, নয় দেবীর পূজা হয়। শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্ধমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদাত্রী, অন্যরূপে নবদুর্গার পূজা, মানেই মহাশক্তির পূজা, "ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, কাত্যায়নী, চণ্ডীপাঠে দেবী দুর্গা, কাত্যায়নীর কথা বলা আছে। এসব অনন্ত বিস্ময়। আরও বলার আছে, কিন্তু সময়াভাবে বলা হল না। কারণ পূজা বাকি আছে।

একজন ভক্ত বলল— প্রভু, সব আহুতি কি অগ্নিতে?

—লক্ষ করে দেখবে সাধুরা, উলঙ্গ সন্ন্যাসী। বিশেষ করে নাগারা সর্বদাই উলঙ্গ, এদের সকলের সঙ্গে অগ্নি থাকে, অর্থাৎ অগ্নিকেই রাখে। অগ্নির জন্যই প্রাণশক্তি উজ্জীবিত। দেহেও তাপ থাকে। অঘোরী সাধুরা, অন্য সধুরাও অগ্নিকে সঙ্গে রাখে। অগ্নিশক্তির আরাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধন-পথ।

বাবা একটু যদি বুঝিয়ে বলেন, এক ভক্তের কথায় বাবা বলেন-- ক্ষিতিতত্ত্বের সাধনায় অনেকসময় লাগে, যুগের পর যুগ কেটে যায়। অপ্ বা জলের সাধনাও সহজ নয়, তাছাড়া মানবদেহেই সত্তর ভাগ জলই থাকে। বায়ু, সাধনাতে অস্থিরতা আসার সম্ভাবনা থাকে, কারণ বায়ু নিজেই অস্থির। স্থির বস্তুর সাধনাতে সবই স্থির হয়ে যেতে পারে, জীবনের গতি কমে যাবে। জলের সাধনাতে পতনের সম্ভাবনা বেশি, কারণ জলমণ্ডল হল দেহযন্ত্রের সাধিষ্ঠান অঞ্চল অর্থাৎ যৌন শক্তির অঞ্চল। প্রাণায়াম করা ভালো, তবে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। যোগের দ্বারা মানুষ, ধীরে ধীরে অতিমানস হয়ে ওঠে। এরা হয়ে যান পরমজ্ঞানী, এদেরই বলা হয় পরমহংস যোগী, যেমন আমাদের রামকৃষ্ণদেব। 'হং' মানে শ্বাস, 'স' মানে প্রশ্বাস, যোগীদের মধ্যে ক্ষমতা থাকে শ্বাস, প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের।

আদিকাল থেকেই অগ্নিদেবের পূজা প্রচলিত। এবার পূজায় মন দিলেন দিব্যানন্দজি, প্রথমেই অর্থ দিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে। তারপর মহাদেবকে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বললেন,

যোগের দ্বারা মানুষ, ধীরে ধীরে অতিমানস হয়ে ওঠে। এরা হয়ে যান পরমজ্ঞানী, এদেরই বলা হয় পরমহংস যোগী, যেমন আমাদের রামকৃষ্ণদেব।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কিছু বলবে? বলবে এসব আবার কি? দেখো, আমি সাধক। সাধকরা সব দেবদেবীকেই তুষ্ট করে থাকেন, তাছাড়া মাতৃপূজায় শিবপূজা করতেই হয়। আবার কৃষ্ণই কালী, আয়ন ঘোষকেই সেই রূপ দেখানো হয়েছে। বুঝলাম জ্ঞানগর্ভের মানুষ। এখানে পূজা হচ্ছে বিশেষ ঘটে, বিশেষ শিলায়। গুহার প্রাচীরে আছে দেব, দেবীর ছবি। কামাখ্যায় শিলাপূজা হয়। অতি আদিকাল থেকেই শিলার পূজার প্রাধান্য প্রচলিত। এখান বহুলভাবে পূজিত হল মহাদেব পাথরে, শিবলিঙ্গে। মা কালীর মূর্তি তো এল অনেক পরে, মহান পণ্ডিত। মহামায়ার আগমবাগীশের তত্ত্বাবধানে। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। পূজা চলছে, অনতিদূরেই রয়েছে খড়ের তৈরি একটি চারপেয়ে মনোনিবেশ করলেন।

বাবা মন্ত্র পড়ে চলেছেন, কালা একটি করে পায়রা হাতে দিচ্ছে। বাবা বামহাতে পায়রা ধরে শুধুমাত্র প্রথম আঙুলটা দিয়ে পায়রাটির গলায় আঘাত করতেই, মুন্ডুটা ছিটকে গিয়ে পড়ল যজ্ঞের অগ্নিতে। পালকহীন, বিশাল বিস্ময়ে, যা দেখছি একি বিশ্বাসযোগ্য, এটাই অলৌকিক। বুঝতে পারছে না, সবাই হতবাক। আঙুলের আঘাতে বলিদান হল। দেখলাম স্বচক্ষে, একে একে দশটি পায়রা বলি হল। আমি পাগলের মতো ছুটে গেলাম তান্ত্রিকের কছে, উনি বুঝেই বললেন— তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তারপর পাঁচ আঙুল দেখিয়ে মাথায় হাত রাখল, রহস্যের হাসি হাসছে। এ কি ভোজবাজি? পরে বললেন—আরও বাকি আছে,

ক্রমাগত ছিটানো হচ্ছে মায়ের স্নান জল, এরপর যা ঘটলো, তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। তবুও বাস্তব চূড়ান্তই বাস্তব।

জন্তুর কাঠামো। বুঝতে পারছি না, এটার কি প্রয়োজন।

বাবা বললেন— ভক্তগণ, এবার হবে চরম উৎসর্গ, হবে বলিদান, সবাই হাত খুলে রাখবেন। ভৈরবী মহিলারা নয়জন এলেন, সবাই সজ্জিতা, পায়ে আলতা পরা, এলোকেশী, স্বল্প বসনা, স্তন যুগল কাঁচুলি দ্বারা আচ্ছদিত। ভৈরবীদের উদ্দেশে পাদার্ঘ্য নিবেদিত হল, দেওয়া হল মিষ্টি, ইতিমধ্যেই কালা এনেছে খাঁচায় আটকানো দশটি পায়রা। ভৈরবীরা একে একে স্বামীজিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে, চলে গেলেন। কিন্তু কারওর কামভাবের প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না।

কালা এসে আমাকে ফিসফিস করে বলে— এটা হচ্ছে কামভাবকে জয় করার প্রক্রিয়া, আরও অনেককিছুই হয়। সত্যিই ভৈরবীদের এবং বাবার কেন কারওর ভিতরে কোনও ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। সকলে আবার পূজায় সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে, হবে। দেখে যাও শুধু।

ইতিমধ্যে খড়ের তৈরি ওই চতুষ্পদের উপর মাটি পড়ে গেছে, চোখ আঁকা হয়েছে। একটা পাঁঠা তৈরি করা হয়েছে। এবার ওটাকে সামনে আনা হয়, ওর উপর মন্ত্রপূত জল ছিটানো হয়। কপালে রক্ততিলক দেওয়া, গুঁড়া হলুদ ছিটিয়ে দেওয়া, তারপর চলতে থাকে মন্ত্র উচ্চারণ। ক্রমাগত ছিটানো হচ্ছে মায়ের স্নান জল, এরপর যা ঘটলো, তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। তবুও বাস্তব চূড়ান্তই বাস্তব। মন্ত্র উচ্চারণের ওই খড়ের পুতুলটার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হল, বাকরুদ্ধ হয়ে দেখছি, একি অতি অলৌকিক খেলা, ওই পাঁঠাকে আনা হল যজ্ঞকুণ্ডের সামনে, আরও অবাক হওয়ার পালা এবার।

বাবার হাতে পাটকঠি, ওই পাটকাঠিকে কাটারির মতো করে পাঁঠাটির গলায় মারতেই, গলাটা কেটে নীচে পড়ে গেল। পাঁঠার মুণ্ডটা মন্ত্র উচ্চারণসহ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অগ্নিতে সমর্পণ করা হল। আমি নির্বাক। মুখে কথা নেই। কেমন যেন ঘোরের মধ্যেই আছি। কালা এসে পাঁঠার ধড়টাকে নিয়ে গেল। প্রভু মহারাজের চোখ রক্তবর্ণ। যেন অন্য মানুষ, খানিকটা কারণ খেয়ে, আমার উদ্দেশেই বললেন— মন্ত্র, শক্তি মাত্রাহীন, তন্ত্রের ক্রিয়া সীমাহীন, গুরুর নির্দেশে শুধু সঠিকভাবে প্রয়োগ করলেই ফল। এই মন্ত্রের দাঁড়াই মারণ, উচাটন, বশীকরণ, উৎপীড়ন, উচ্ছেদ ইত্যাদি ক্রিয়া করা যায়। তবে মন্ত্রের দ্বারা অন্যের ক্ষতি, বিশেষ করে মারণ না করাই উচিত।

সর্বশেষে বাবা বললেন— এই রাত্রে সবাইকে গরম লুচি তরকারি মিষ্টি দিতে হবে। কালা আয় ভিতরে। সবাই অবাক, এই রাত্রে, এই নির্জনে, জনমানব শূন্য প্রান্তরে, গুহার মধ্যে কি করে সম্ভব হবে?

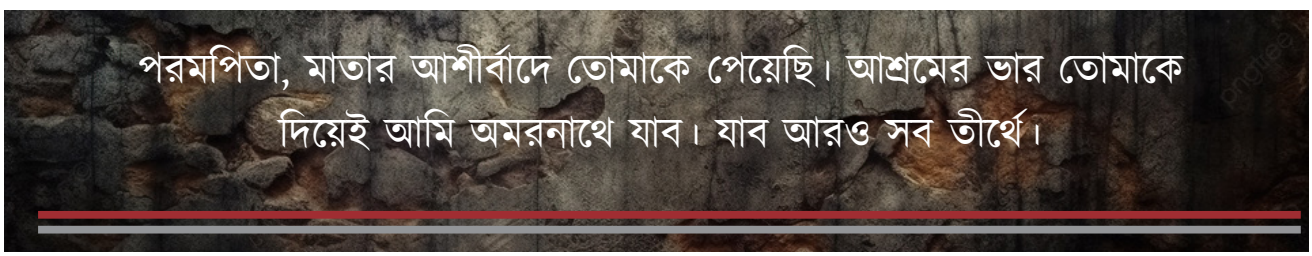

তবে এটাও ঠিক বাবার কথা কখনও মিথ্যা হয় না বা অতীতেও হয়নি। আধ ঘণ্টা পরে দুটি ষণ্ডামার্কা ভীষণদর্শন মানুষ এসে বড় এক ঝুড়ি কচুরি, আর এক টিন ভর্তি গরম তরকারি, সঙ্গে বেশ কিছু পান্তুয়া রেখেই কোনও কথা না বলেই চলে গেল। বলা ভালো হওয়ায় মিলিয়ে গেল। তবে ওই রাত্রে, ওইরকম নির্জন প্রান্তরে ভক্তরা বেশ আনন্দ করে খেল কচুরি, তরকারি, মিষ্টি। এত সুস্বাদু তরকারি মনে হয় জীবনে খাইনি। কচুরি যেন এইমাত্র ভেজে আনা, বেশ গরম। সবার সঙ্গে আমিও খাচ্ছি, বেশ ভালো লাগছে, দেখছি একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাবা তৃষ্ণার্ত হয়ে শুধু ডাবের জল খাচ্ছেন, পাশে দাঁড়িয়ে একজন কাটছে ডাব, এক কাঁদি থেকে।

মনে মনে ভাবছি, এই রাত্রে উনি কীভাবে ডাব সংগ্রহ করলেন? এ তো দেখছি আলাদিনের প্রদীপ, যা ইচ্ছা করবেন, তাই পাবেন।

কিছুক্ষণ পরে রাত প্রায় শেষে, ভোর হবে, এমন সময়ে তান্ত্রিক আমাকে ডেকে বললেন— সকালে উঠে নদীতে স্নান করে, ওপরে ভৈরব, অর্থাৎ মহাকাল শিব উমানন্দের দর্শন সেরে আসবে। তোমাকে পরমার্থে, পরার্থে কিছু বলব। আমার আশ্রমের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে, তবে যথা সময়ে আমার নির্দেশ পাবে।

আমি সভয়ে বলি— প্রভু, আমাকে এই গুরুদায়িত্ব কেন দিচ্ছেন?

—দেখো, পূর্বেই বলেছি, আমি প্রকৃত আধারের সন্ধানে ছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় তা পেয়েছি। তুমিই নির্লোভী, আকাঙ্ক্ষাবর্জিত মানুষ। সেবা ধর্মে এইরকম ব্যক্তির প্রয়োজন আছে। আমি হিমালয়ের কোণে কোণে যত তীর্থ আছে, দর্শন করব, পূজা দেব, এটাই আমার মনের কামনা, বাসনা। আশ্রমের দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে আমি হব সম্পূর্ণ তাঁরই নির্ভর। আমাকে স্মরণ করিলেই মধ্যরাত্রে দর্শন পাবে, পাবে যথোচিত নির্দেশ। তোমার মতো শিষ্যের খোঁজেই এতকাল অপেক্ষায় রয়েছি। পরমপিতা, মাতার আশীর্বাদে তোমাকে পেয়েছি। আশ্রমের ভার তোমাকে দিয়েই আমি অমরনাথে যাব। যাব আরও সব তীর্থে। শেষে বলি, মায়ের আশীর্বাদে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। সর্বদাই জপ করবে, "ওঁ হ্রীং দক্ষিণা কালীকায়ৈ নমঃ।" "ওঁ শ্রীশ্রী চণ্ডীকায়ৈ নমঃ।" "ওঁ হৌং বাণেশ্বর শিবায় নমঃ, ওঁ শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ জুং সঃ।" দেখবে সব বিপদ দূরে চলে যাবে, সঙ্গেসঙ্গে চলে আসবে অতি শুভ সংকেত। এটাই আমার চরম সিদ্ধান্ত। আমি কিংকর্তব্যভাবে নত হয়ে, বিনম্রভাবে বলি, "গুরুর ইচ্ছাই আমার প্রাধান্যের বিষয় গুরুহী কৃপা কেবলম্। জয় গুরু, ওঁ হৌং শিবায় নমঃ, ওঁ ক্লীং দক্ষিণা কালীকায়ৈ নমঃ নমঃ।"

এখন আমি কিন্তু আমাতে নেই, নেই আমিত্বে, মনে মন্ত্র তনুতে তন্ত্র।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

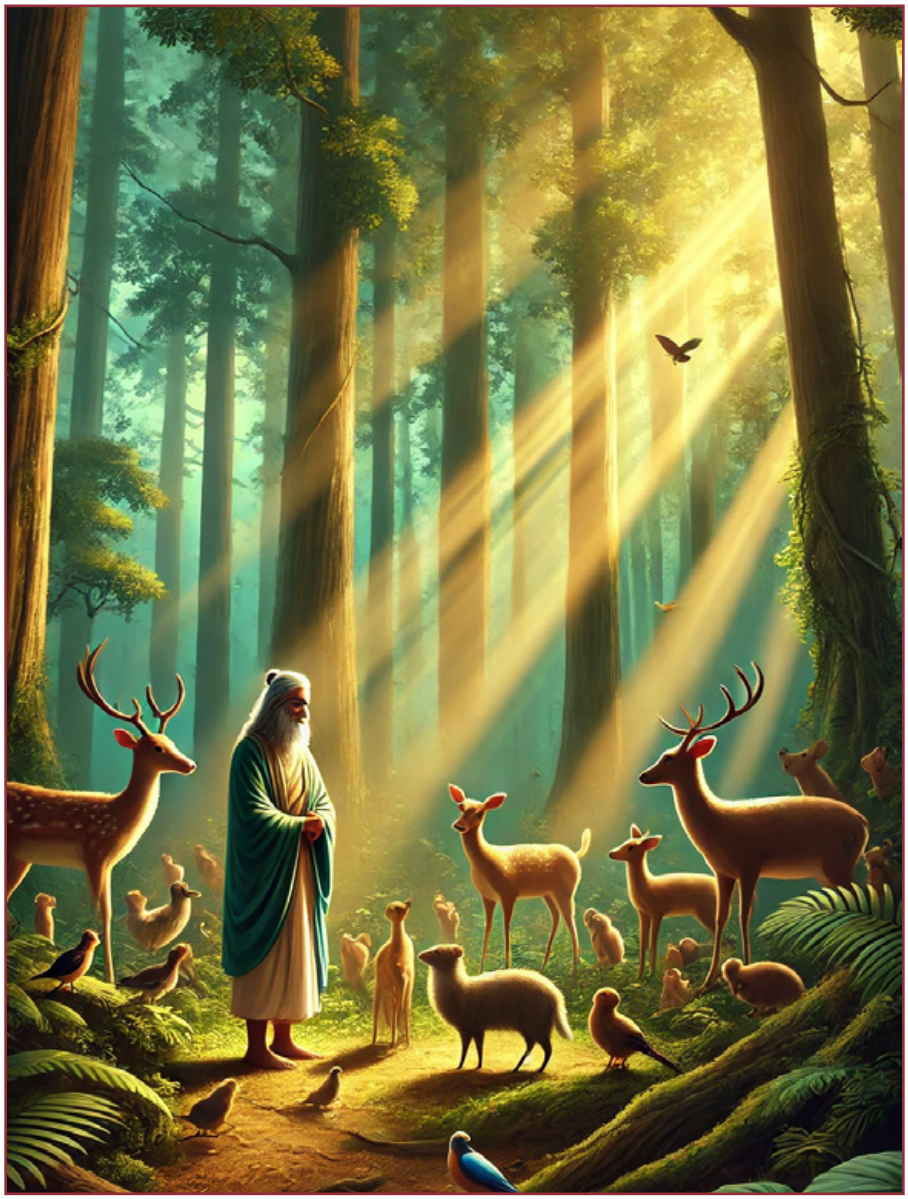

ভৈরব তান্ত্রিকের মায়াজগৎ

দেবনারায়ণ দাস

পর্ব ১

ভৈরব তান্ত্রিক, শ্মশানকালীর পরম ভক্ত, সঙ্গে গরিব মানুষদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে সমাজসেবা করেন। তাই ভক্তের অভাব নেই। সারাদিন ভক্তের গুরুসেবায় দিনান্তে যেটুকু জোটে, তাই দিয়ে মায়ের পূজা ও নিজেকে নিয়ে চলে যায়।

এই কাহিনি উনিশ শতকের গোড়ার কথা। তখনকার দিনে শ্মশান মানে, নদীর তীরে গভীর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অরণ্য। জনহীন ধু ধু প্রান্তর। দিনেরবেলায় শিয়াল-নেকড়ের দল মরা মানুষের মাংসের লোভে ঘুরে বেড়ায়। সেখানেই ভৈরব তান্ত্রিকের ছোট্ট কুটির। ভয় কাকে বলে তিনি জানে না। ভক্তদের তিনি বলেন, আমার মন্ত্রের জোরে জীবজন্তুরা আমার আশপাশেই বসে থাকে। গভীর অরণ্যে ওরাই আমার ভক্ত।

ব্রহ্মডাঙার প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে ছোট ছোট কয়েকটি আদিবাসীদের গ্রামের পর গভীর অরণ্য শুরু হল। সেই ঘন অরণ্যের ভেতর দিনেরবেলাতেও সূর্যের আলো ঢোকে না। চারিদিকে বাঘের গর্জন, শিয়ালের ডাক, আর ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের ছোটাছুটির শব্দ শোনা যায়।

এদিকে ভৈরব তান্ত্রিকের বিশ্রাম নেই। তাঁর দৃষ্টি চারদিকে। জন্তুজানোয়ার সবাই বশ মেনেছে। বড় বড় জানোয়ার নয়, তিনি বরং অসহায় অথচ দুর্বল প্রাণীদের প্রতি বেশি লক্ষ রাখেন।

একদিন তিনি গোভূতের দলকে সঙ্গে নিয়েই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। অনেকটা হেঁটে গাছের ছায়ায় বসে । তাঁকে দেখে বনের বাঘ-সহ সমস্ত জীবজন্তু চলে আসে। ভৈরব তান্ত্রিক বনদেবীর কপটমন্ত্র পাঠ করে সামনে তাকান। ছোটদের ইশারা করেন। একটা বনরুই করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তান্ত্রিক বলেন, মনে হচ্ছে ছোট্ট প্রাণীর মনে খুব কষ্ট। বনরুই তুমি তোমার সমস্ত দুঃখ খুলে বলতে পারো।

বনরুই পূর্বের ইতিহাস থেকে তার আজকের অবস্থা বলল। অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের বাস। আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু মানুষরা হঠাৎই আবিষ্কার করল, আমাদের পিঠের আঁশ থেকেই মহৌষধ তৈরি হয়। তারপর থেকে গোটা বিশ্ব জুড়েই শুরু হয়ে গেছে আমাদের নিধন পর্ব।

পরদিন ভৈরব তান্ত্রিক সাধনায় বসবেন, হঠাৎ ভক্তরা জিজ্ঞেস করে, বাবা আপনি কোন ধর্মের মানুষ?

বাবা শান্ত হয়ে উত্তর দিলেন, আমি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, হিন্দু কেউ না। আমার ধর্ম একটাই, আমি তান্ত্রিক। আমি তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে অসাধ্য সাধন করতে পারি।

-তাহলে এত গাছপালা, শিকড়, ফল, ফুল, পাতা দিয়ে আপনি জাদু করেন কিভাবে?

আসলে ভৈরব সাধু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ভালো জানে। যে-কোনও রোগ সারাতে পারেন। তবু শ্মশানকালীর সামনে তার কপট মন্ত্র ও প্রলয় তন্ত্রের প্রয়োগ সাংঘাতিক। ভক্তরা জানে, ভৈরব

মায়ের সামনে সাধনায় বসলে বাঁহাতে মাথার খুলি আর ডান হাতে কঙ্কালের হাড়। ওটাই জাদুদণ্ড।

তান্ত্রিকের মন্ত্রের সাধনাতে সবকিছু সম্ভব।

মায়ের সামনে সাধনায় বসলে বাঁহাতে মাথার খুলি আর ডান হাতে কঙ্কালের হাড়। ওটাই জাদুদণ্ড।

ভৈরববাবার চোখ দুটো টকটকে লাল। মাথায় জটার উপর কাপড় বাঁধা। কপালে, গলায় চন্দন তিলক, সবসময় কারণ পান করে নেশায় ডুবে থাকেন। কিন্তু হুঁশ টনটনে।

পাশের আদিবাসী গ্রামের পূর্ণিমা মান্ডি তার ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়েই ব্যস্ত। সকাল হলেই মেয়েটি ছোট্ট মাটির ঘরকে আলোয় ভরিয়ে রাখে। পিছনের গভীর বাঁশবনের পাশেই একটা ঝোরা অনেক দূরের মাঠ পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ছোট্ট মেয়েটির নাম ফুলমণি। ও কখনও মুরগির ঝুঁটি ধরে কখনও কুকুরের বাচ্চা, বিড়াল ছানার সঙ্গে খেলা করে। এভাবেই ছোট্ট ফুলমণির দিন কাটে।

ভৈরববাবা তন্ত্রবলে জানতে পেরেছেন, ফুলমণি প্রেতলোক থেকে মধ্যম গিন্নির আদেশ নিয়ে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মনুষ্যজনম পেয়ে এখানে এসেছে। আদিবাসী গ্রাম, তাদের সবসময় বিপদ, তাই সে গ্রামের মানুষদের উপকার করবে।
ভৈরব সাধু সামনে দর্পণ রেখে তন্ত্র বলে সব দেখতে পান।

পর্ব ২

সেই কোন কালের কথা।
ভয়ানক সেইসময়। পাহাড়চূড়ায় ছিল প্রেতলোক। মধ্যম গিন্নি মরে প্রেতলোকে গেছে। সেখানে নানান কাজ। প্রেতলোকেই থাকে পান্থ মহারাজ। তাঁর আদেশে সবাই চলে। সেই পান্থ মহারাজ একবার জঙ্গলে

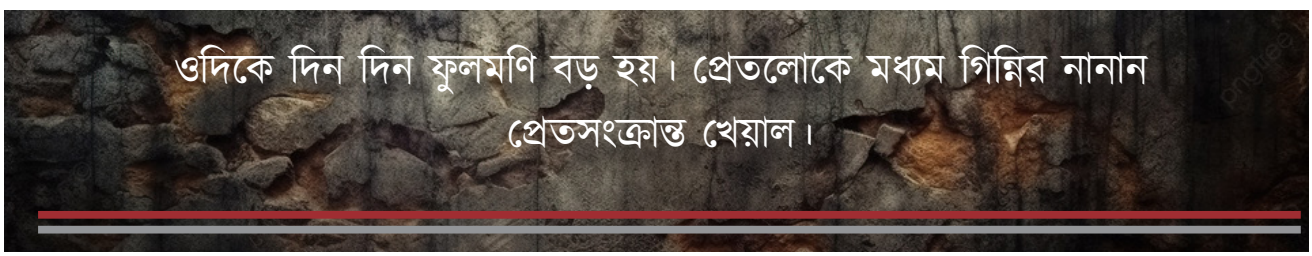

দেখতে পেলেন, আদেশ কিছু শয়তান মানুষ জীবজন্তু মেরে হাড় চামড়ার ব্যবসার দিকেই নজর দিচ্ছে। এই বিপদ থেকে আদিবাসীদের বাঁচাতেই হবে। কি করা যায়?
নানান অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, অতি প্রাচীনকাল থেকেই চিনে জীবজন্তুর হাড়-চামড়ার অংশ দিয়েই নানান রকমের ওষুধ তৈরি হত, আবার ওই ওষুধ নানান দেশ ঘুরে, আমাদের দেশেই বিক্রি হত। ভীষণ রেগে পান্থ মহারাজ মধ্যম গিন্নির প্রেতাত্মাকে দায়িত্ব দিলেন। গিন্নির ভয়ংকর সাহস। পাহাড়ে, জঙ্গলে থাকতে পারে।
ভৈরব অগ্নি সাধনায় সেই পান্থ মহারাজকে ধরেন। জানতে পারেন, জমিদারদের প্রেতলোকের সঙ্গে কোনওরকম ভাব নেই। ওরা মানুষ মরলেই, হয় গয়া, নয়তো গঙ্গার জলে পোড়া অস্থিকে ভাসিয়ে দেয়। এই করে প্রেতলোকে ক্রমশ প্রেত সংখ্যা কমে আসছে। এর জন্য দায়ী ওই জমিদার। তিনিই মনুষ্যলোকের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সেইসঙ্গে, শিকার ও বিনোদনের জন্য অসহায় জীবজন্তুদের মারছে। তাদের হাড়, চমড়ার ব্যবসার জন্য দেহকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে যায়। সেইজন্য সেই জীবের আত্মারা দল বেঁধে গিয়ে মধ্যম গিন্নির প্রেত-আত্মার কাছে নালিশ করে। মধ্যম গিন্নি, সে রেগে আগুন। সঙ্গেসঙ্গেই, প্রেতলোকের মহারাজকে বলে ওদের মধ্যে থেকে একজনকে ফুলমণি করে নতুন জীবন দিয়ে মনুষ্যসমাজে পাঠায়। সেই কর্মের রূপদান হচ্ছে ফুলমণি।
জন্মের শুরুর দিন থেকেই, ফুলমণির জীবজন্তুদের সঙ্গে খুব ভাব। আরও আশ্চর্য, জীবজন্তুরাও ফুলমণির কাছে ছুটে যায়।
ওদিকে দিন দিন ফুলমণি বড় হয়। প্রেতলোকে মধ্যম গিন্নির নানান প্রেতসংক্রান্ত খেয়াল। তার জাদুবলে ফুলমণির শরীর পুরুষের মতো গাঁট্টাগোট্টা হয়ে উঠল। এখন আর ওকে কেউ ফুলমণি বলে না। বলে মণিদিদি। সে কবেকার কথা। অসহায় জীবজন্তুদের, সে বন্ধুর মতো। আর শিকারিদের সে ছিল চরম শত্রু। মধ্যম গিন্নির জাদুতে বনের জীবজন্তুর দল ওর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে লাগল। ফুলমণির দুরন্ত গতি দেখে, ফুলমণির মায়ের খুব ভয়। মায়ের একটাই আশা ফুলমণির আয়ু যেন বেশি হয়। কবে ফুলমণির বাপ চলে গেল। ছোট্ট ফুলমণির মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমা মান্ডি যখন ঝর ঝর করে কাঁদছিল, তখন মধ্যম গিন্নির প্রেতআত্মার দয়া হল।সেই থেকেই ফুলমণির

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আর ফুলমণির মায়ের দায়িত্ব মধ্যম গিন্নির প্রেতলোক গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, মধ্যম গিন্নির প্রেতলোক অসহায় মেয়েদের যে-কোনও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

আজ থেকে একশো বছর আগে বা তারও আগে একটা গ্রাম থেকে আর একটা গ্রামে যেতে গেলে পাঁচ দশ ক্রোশ রাস্তা কোনও ব্যাপারই না। বর্ষার সময় জমির আইল ধরে বা গামছা পরে নদী বা কাঁদর পেরিয়ে পুরষ মানুষরা যাতায়াত করত। মেয়েদের জন্য ছিল গরুর গাড়ি, যাকে বলে গোগাড়ি। আর জমিদারদের জন্য ছিল সব রাজকীয় পালকি। অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যেতে গেলেও, সেই গরুরগাড়ি ভরসা। আর এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করত গরুর গাড়ির ভূতরা। আর তাদের রানি ছিল মধ্যম গিন্নির প্রেতাত্মা।

কালীমণির মা কাঁপা কাঁপা শীর্ণ হাত দুটিকে জড়ো করে গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই, গাড়োয়ান খোঁনা খোঁনা গলায় বলল, কোথায় যাবেন বুড়িমা?

পর্ব ৩

বাগদি পাড়ার কালীমণির মা, খুব চিন্তিত। তার আদরের মেয়ে কালীমণির ছেলে হবে গো। ডোমের দায়মাকে খবর দেওয়ার জন্য কালীমণির মা বেঁকে যাওয়া শরীরটাকে নিয়েই, একটা বাঁকাটেরা লাঠির ওপরই ভর দিয়ে কোনওরকমে চলল। একে এই শরীর, তার ওপর আড়াই ক্রোশ হেঁটে যেতে হবে কাঁদরের ওপারে ডোমেদের গ্রাম। অসহায় চোখেই কঠোর সূর্যর প্রখর তেজ বাঁ হাত দিয়েই আড়াল করতে করতেই চলল। মাঝে মাঝেই কোথাও গাছের ছায়ায় বসে পড়ে বলে, “ভগমান, এখন আমাকে তুলে নিস না বাপ, আমার কালীমণির ছেলোটা হয়ে যাক, তারপর নে কেনে যা আছে তাই হবে।”

বুড়িকে দেখে মধ্যম গিন্নির দয়া হল। সে তো চায় সাহায্য করতে। এদের জন্য ই তো ওর প্রেতলোকে আসা। যে মনুষ্যজীবনে সে কিছুই করতে পারেনি, আজ সে তাই করে দেখাবে। সে গরুর গাড়ির ভূতদের আদেশ করল, এখনই গরুর গাড়ির ব্যবস্থা কর, কালীমণির মাকে ডোমেদের গ্রামে ডোমনির ছোট মাটির চালা ঘরে পৌঁছে দে।

এদিকে কালীমণির মা তো অবাক! কোথা থেকে এত সুন্দর গরুর গাড়ি চলে এল। কি তাগড়াই বলদ জোড়া। কি সুন্দর ছাউনি দেওয়া, নকশি কাঁথা মোড়ানো গরুর গাড়ি। এমন সুন্দর গাড়ি সে জীবনে দেখেনি। কিন্তু আমাকে কি ওই গাড়িতে উঠতে দেবে?

কালীমণির মা কাঁপা কাঁপা শীর্ণ হাত দুটিকে জড়ো করে গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই, গাড়োয়ান খোঁনা খোঁনা গলায় বলল, কোথায় যাবেন বুড়িমা?

এত সুন্দর মিষ্টি কথা কালীমণির মা কোনওদিন শুনে নাই। এ কি ভগমান তার জন্য পাঠিয়েছেন। অসহায় মানুষের দল সে যুগে ভগমান ছাড়া কিছুই বুঝতে পারত না। গরুর গাড়ির ভূতের দৌলতে কালীমণির মা সে যাত্রায় উদ্ধার পেল। প্রেতলোকে মধ্যম গিন্নির আনন্দ আর ধরে না। এদিকে নিজের আসনে বসে ভৈরববাবা তার সম্মুখ দর্পণে সব দেখতে পাচ্ছেন।

তান্ত্রিকের তন্ত্রসাধনা সার্থক। যুগে যুগে তিনি এই মায়াজাগতে আসবেন, আর নিজের তন্ত্রসাধনা এই বিশ্বজগতে পাপ-পুণ্যের সমাধান করবেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এবং মধুসুন্দরী দেবী

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

হুড়মুড় করে বিছানা থেকে উঠে বসলাম আমি। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাতটা পাঁচ। আজ ভোর রাত থেকে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম অমর জীবন এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। তাকে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তারানাথের কাছে আমি কেবল অমর জীবনের কথা শুনেছি মাত্র। আমার স্বপ্নেও তার কোনও স্পষ্ট মুখ প্রস্ফুটিত হয়নি। আমার স্বপ্নে সে দেখা দিয়েছিল কেবল একটা আবছা অবয়ব হিসেবে।

সে সর্বদা বলে চলেছিল মধুসুন্দরী দেবীর কথা। মধুসুন্দরী দেবীর নামটা বারংবার উচ্চারণ করছিল সে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেদিন সারাদিন অফিসের কাজকর্ম যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম বাড়িতে গিয়ে একবার সোজা কিশোরীর বাড়ি যাব ওখান থেকে ওকে সঙ্গে নিয়ে মঠ লেনে তারানাথের বাড়ি যাব। আজ কেন জানি না তারানাথের গল্প খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।
বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম আমার চিন্তাকে কাকতালীয়ভাবে সত্যি করে দিয়ে আমার ঘরে বসে আছে কিশোর। আমার স্ত্রী আমাকে বলল,
"এই তো তুমি এসে গেছ। কিশোরী ঠাকুরপো অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে। আমি বলছিলাম যে একটু পরেই তুমি চলে আসবে। ঠাকুরপোকে বললাম চা খাবে, কিন্তু ঠাকুরপো বলল চা খাবে না।"
আমি ঘরে ঢুকতেই কিশোরী আমাকে বলল, "চলো হে, ঝটপট তৈরি হয়ে নাও তারানাথের কাছে যাওয়া যাক। অনেকদিন তারানাথের বাড়ি যাওয়া হয়নি।"
আমি কিশোরীকে বললাম, "তুমি আজকে আমার একদম মনের কথা বলেছ। আজকে আমিও ভাবছিলাম তোমার বাড়ি যাব। গিয়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তারানাথের বাড়ি যাব।"

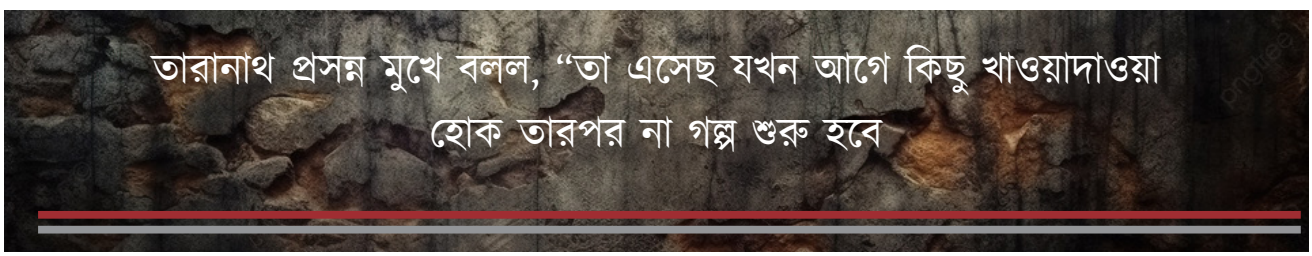

বাড়ির সামনের মোড়ের মাথার তেলেভাজার দোকান থেকে গরম গরম তেলেভাজা আর মুড়ি কিনে নিয়ে তারানাথের বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করলাম। তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে আধ ঘণ্টার রাস্তাটা কুড়ি মিনিটে শেষ করে তারানাথের বাড়ি পৌঁছে দেখলাম তারানাথের বাড়ির গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে চারি। আমাকে দেখে চারি একগাল হাসল,

"আরে কাকাবাবু যে, আমার গ্রামাফোনের ক্যাসেটটা নিয়ে এসেছেন আপনি?"
জিভ কাটলাম আমি, "এইরে আমি একদম ভুলে গেছি। বাড়িতেই ওটা রাখা আছে। পরেরবার তোমার জন্য ঠিক নিয়ে আসব কেমন।"
"আচ্ছা এখন ভেতরে চলুন বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।"
আমি আর কিশোরী চারির পিছন পিছন ভেতরে গিয়ে বসলাম।
চারি, বাবাকে খবর দিয়েছি । বাবা বলল সান্ধ্য গায়ত্রী করছি। ওটা করেই আসছি। আমরা তারানাথের বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। মিনিট

> তারানাথ প্রসন্ন মুখে বলল, "তা এসেছ যখন আগে কিছু খাওয়াদাওয়া হোক তারপর না গল্প শুরু হবে

পাঁচেক পরেই তারানাথ এসে ঘরে ঢুকল
"শুভ সন্ধ্যা, কেমন আছ তোমরা?
কিশোরী বলল,
"আমরা ভালো আছি। তারানাথ আজকে হঠাৎ তোমার কাছে গল্প শোনার খুব ইচ্ছে করছিল তাই তোমার কাছে গল্প শুনতে এলাম।"
তারানাথ প্রসন্ন মুখে বলল, "তা এসেছ যখন আগে কিছু খাওয়াদাওয়া হোক তারপর না গল্প শুরু হবে। দাঁড়াও চারিকে তেল-কাঁচালঙ্কা দিয়ে মুড়ি মেখে নিয়ে আসতে বলি।"

আমি তারানাথকে বারণ করলাম, "তার আর দরকার নেই। আজকে আমরাই তোমার জন্য তেলেভাজা আর মুড়ি নিয়ে এসেছি।"
"তাই নাকি তা বেশ করেছ।"
গরম তেলেভাজাতে কামড় দিয়ে তারানাথ বলল,
"তোমরা যখন এখানে এসেছ বলো কি গল্প শুনতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

চাও।"

আমি বললাম,

"তারানাথ অনেকদিন মধুসুন্দরী দেবীর গল্প শোনা হয়নি আপনি তো মধুসুন্দরী দেবীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন আজ একটা নয় মধুসুন্দরী দেবীর গল্প হোক।"

আমার কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই তারানাথের চোখে-মুখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল! একগাল হেসে এসে বলল,

"সমপাত মানে জানো তোমরা?"

কিশোরী বলল,

"হ্যাঁ জানি সমপাত মানে হচ্ছে কো ইনসিডেন্স বা যাকে আমরা বলি কাকতালীয়।"

"হ্যাঁ। তোমরা ঠিকই বলেছ আজ সকাল থেকেই আমার মনে শুধুমাত্র মধুসুন্দরী দেবীর কথাই ঘুরে-ফিরে আসছে। বলতে গেলে সারাটা দিনই আজকে আমি ওঁর চিন্তাতেই মগ্ন। আর দেখো ঠিক আজই তোমরা গল্প শুনতে এলে আর এসে মধুসুন্দরী দেবীর গল্প শুনতে চাইলে তাই এটাকে কি তোমরা সমপাত বলবে না? এটা সমপাত না হলেও ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা যেতে পারে। ঠিক আছে, আজ যখন মধুসুন্দরী দেবীর চিন্তাই মাথায় আসছে আর তোমরাও যখন মধুসুন্দরী দেবীর কথাই তুললে তাহলে ওঁকে নিয়ে একটা গল্প বলা যাক।" হাতে ধরা বাটির মুড়ি আর তেলেভাজা খেয়ে তারানাথ কিশোরীর থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিল। সেটা মুখে ধরিয়ে সুখটান দিতে দিতে তারানাথ বলল,

"তোমরা তো জানোই আমার জীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছে ভবঘুরে জীবন হিসেবে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। আজকে এখানে তো কালকে সেখানে। তবে খুব বেশিদিন এক জায়গায় থাকতাম না। বেশিদিন এক জায়গায় থাকলে ভবঘুরে জীবনের স্বাদ আর পাওয়া যায় না। সেবার বীরভূমের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে অতিথি হয়ে থেকেছিলাম বেশ কিছুদিন। সেখান থেকে যখন বিদায় নিলাম তখন ঠিক করেছিলাম অনেকদিন হল এবারে কিছুদিনের জন্য নিজের বাড়ি ফিরে যাব। মায়ের জন্য মনটা বড় ছটফট করছে। একদিন ওই ব্রাহ্মণদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার জন্য সকালে স্টেশনে ট্রেনের জন্য বসে আছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে আমার ট্রেন আমি তৈরি হয়ে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ করে কোথা থেকে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে

গালে বেড়ে উঠেছে বড় বড় দাড়ি কেবল পোশাকটা ভদ্র পরে আছে বলেই তাঁকে মনে হচ্ছে তিনি ভদ্রবাড়ির লোক।

দেখে ভদ্রবাড়ির লোক বলে মনে হয়। তবে তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছুদিন যাবৎ খুব কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছেন তার মানসিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। চোখের তলায় কালি পড়েছে। মুখটা যেন শুকিয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে মুখে একটা লালিত্য ছিল কিন্তু সেই লালিত্যটা এই ক'দিনে হারিয়ে গেছে। গালে বেড়ে উঠেছে বড় বড় দাড়ি কেবল পোশাকটা ভদ্র পরে আছে বলেই তাঁকে মনে হচ্ছে তিনি ভদ্রবাড়ির লোক। ইতিমধ্যে আমার ট্রেন সামনে চলে এসেছে ঠিক এইসময় ভদ্রলোক বললেন,

"ঠাকুরমশাই আমার বড় বিপদ। ঠাকুরমশাই আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।"

বিপদের কথা শুনে আমি আর ট্রেনে উঠতে পারলাম না। ট্রেনটা আমার সামনে দিয়ে শব্দ করতে করতে অজগর সাপের মতো বাঁকা রেললাইন দিয়ে সোজা গিয়ে দূরে ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভদ্রলোক দু'হাত জোড় করে বললেন, "আমার নাম দুর্গামোহন সমাদ্দার বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমি আপনাকে এখানে বসে থাকতে দেখে আপনার কাছে দৌড়ে এলাম আপনি যদি আমার উপকার করতে পারেন আমার নিত্যদিন বয়ে চলা মানসিক যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারেন। তার জন্য।"

"কি সমস্যা?"

দুর্গামোহনবাবু বললেন,

"আমার মেয়ের বড় বিপদ ঠাকুরমশাই।সে মাঝে মাঝেই কয়েকদিন ধরেও উন্মাদের মতো আচরণ করছে। অনেক ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়েছি ঠাকুরমশাই। কিন্তু কেউই আমার মেয়ের আসলে কি রোগ হয়েছে বা এই রোগের চিকিৎসা কি? এই

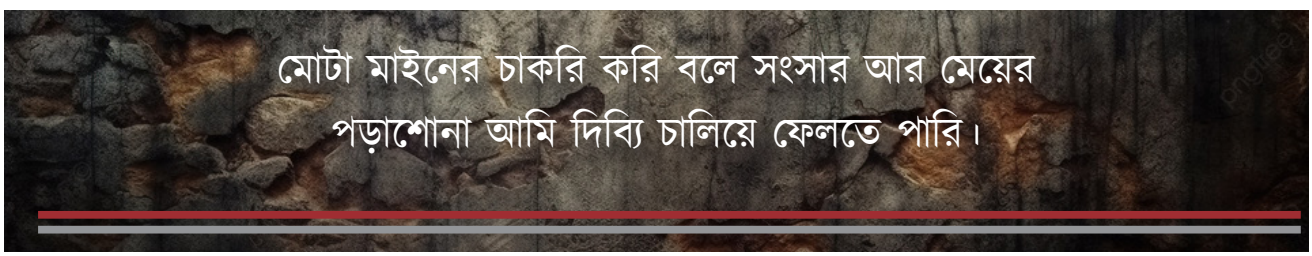

রোগ থেকে মুক্তির উপায় কি, সেটা কেউ বলতে পারেনি।

"ঠিক আছে চলুন আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ি আমি যাচ্ছি কিন্তু কতদূর কি করে উঠতে পারব সেটা আমি বলতে পারছি না।"

"তাই চলুন ঠাকুরমশাই।"

দুর্গামোহনবাবু অদূরে হাত নাড়িয়ে একটা হাতেটানা রিকশা ডাকলেন। তারপর আমরা দুজন এগিয়ে গিয়ে রিকশায় উঠে বসলাম। রিকশা চলতে শুরু করল। আমি বললাম,

"এবার আপনি আপনার মেয়ের সমস্যা থেকে শুরু করে যাবতীয় ঘটনা আমাকে বিস্তারিতভাবে নির্দ্বিধায় বলুন। কোনওকিছু গোপন করবেন না। মানুষ যখন মোক্তার আর বদ্যিকে সমস্ত কথা বলে, ঠিক সে রকম।"

"বলছি ঠাকুরমশাই আপনাকে সব বলছি কোনওরকম গৌরচন্দ্রিকা না-করে সব বলব বলেই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আর বিধাতা ঠিক আজকেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছে।

আমার বাবা-মা খুব ছোটবেলায় মারা যায়। সেইথেকে আমি আমার মাসির কাছেই মানুষ। মাসি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। লেখাপড়া শিখে সওদাগরি অফিসে চাকরি পেয়েছি। আমার অফিস বঙ্গদেশের বাইরে। আমি সেখানেই চাকরি করছি। বেশ কিছুদিন চাকরি করতে করতে এখানে এসে একটা বাড়ি বানাই বিয়ে-থা করি। তারপর এখানে আমার মেয়ে বৈদেহি জন্মায় ও তারপর আবার মেয়েকে রেখে আমি চলে যাই ওখানে। আমার মেয়েটা আমার স্ত্রীর কাছেই মানুষ হয় ওর এখন বয়স ১৯ বছর। আমি বছরে দুবার বাড়িতে আসি। মোটা মাইনের চাকরি করি বলে সংসার আর মেয়ের পড়াশোনা আমি দিব্যি চালিয়ে ফেলতে পারি। মেয়ে পড়াশোনা শেষ করেছে তাই এবার আমরা ওর বিয়ে দিতে চাই। পাত্র আমাদের খুব পরিচিত। পাত্রের নাম সঞ্জয় চাকলাদার। পাত্র আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়র ভাইপো ছোটবেলা থেকেই পাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। খুব উজ্জ্বল ছাত্র। পড়াশোনার মান ও ফলাফল ভালো দেখে সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে ওকে। সেই অনুদানের টাকা দিয়ে ও পড়াশোনা করছে। বাংলায় স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা করছিল এটার পরই ও চাকরি পেয়ে যাবে। চাকরিটা পেয়ে গেলেই ওর সঙ্গে আমি বৈদেহির বিয়ে দিয়ে দেব। ও প্রায় তিন মাস হল আমাদের বাড়িতেই আছে। আমাদের বাড়িতে ওর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জন্য একটা ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই ঘরেই থাকে। বিয়ের পর আমার মেয়েকে নিয়ে ও চলে যাবে ওর নিজের বাড়িতে ওর বাবা-মায়ের কাছে। কিন্তু কি থেকে যে কি হয়ে গেল আমাদের এই সমস্ত সুন্দর পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে দিল আমাদের মেয়ের এই ধরনের অদ্ভুত আচরণ।ঠিক যেন উন্মাদ হয়ে গেছে একেবারে সারাক্ষণ পাগলের মতো থাকে বিড়বিড় করে কি সমস্ত বলে নিজের মাথার চুল নিজে টানে। সারাক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। এক এক সময় ঠিক হয়ে যায়, আবার এক এক সময় এই মানসিক উন্মাদনাটা ওর ভেতরে ভর করে।“

রিকশাটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের দুর্গামোহনবাবুদের গ্রামে উজানতলিতে পৌঁছে দিল। এখানে এসে দেখলাম গ্রামের অবস্থা খুব শোচনীয়। দুর্ভিক্ষ গিলে খেয়েছে গোটা গ্রামটাকে। দেখে মনে হচ্ছে, মানুষ অনাহার আর জলকষ্টে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে।

অবাক হলাম আমি,
“গ্রামের এমন অবস্থা কবে থেকে হল?”
দুর্গামোহনবাবু বললেন,
“বৈদেহী যখন মানসিকভাবে উন্মাদ হয়ে পড়ে সেইসময় থেকেই গ্রামের এমন অবস্থা। বৈদেহী যবে থেকে মানসিক উন্মাদ হয় তখন আমি এখানে ছিলাম না তো। আমি তাই কবে থেকে দুর্ভিক্ষ হয় সেটা ঠিকঠাক বলতে পারছি না। আমি এখানে আসবার পর থেকেই দেখছি গ্রামে দুর্ভিক্ষ লেগেছে। আর বৈদেহীর এমন অবস্থা।”

দুর্গামোহনবাবুদের বাড়িতে এসে দেখলাম এখানে দুর্ভিক্ষ এলেও এই বাড়িটাকে দুর্ভিক্ষ একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ একটাই। দুর্গামোহনবাবুর আর্থিক স্বচ্ছলতা। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে শান বাঁধানো উঠোনে দাঁড়াতেই দুর্গামোহনবাবুর স্ত্রী ললিতা দেবী এসে জল দিয়ে আমার দুটো পা ধুয়ে দিলেন।
অবাক হয়ে আমি বললাম,
“আরে এ কী করছেন এসবের আবার কী প্রয়োজন!”
দুর্গামোহনবাবুর স্ত্রী মাথা নিচু করে বললেন,
“আপনি আমাদের অতিথি তার উপর আবার ব্রাহ্মণ। তাই এইটুকু অতিথিসেবা আমাকে করতে দিন ঠাকুরমশাই। “
“একটু বিশ্রাম নিন ঠাকুরমশাই। তারপর আপনাকে বৈদেহীর ঘরে নিয়ে যাব।“ কথাটা বলে দুর্গামোহনবাবু একটা শতরঞ্চি বারান্দার উপর বিছিয়ে দিলেন। তারপর সেই শতরঞ্চির উপর আমরা দুজন বসলাম।

ইতিমধ্যে দুর্গামোহনবাবুর স্ত্রী ললিতা দেবী আমাদের দুজনের জন্য গরম গরম পরোটা আলুভাজা আর চমচম নিয়ে এলেন।

দুর্গামোহনবাবু বললেন,
“বৈদেহী এখন একটু শান্ত আছে, ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে উঠলে আপনাকে ওর ঘরে নিয়ে যাব।“
ইতিমধ্যে দুর্গামোহনবাবুর স্ত্রী ললিতা দেবী আমাদের দুজনের জন্য গরম গরম পরোটা আলুভাজা আর চমচম নিয়ে এলেন।
খেতে খেতে দুর্গামোহনবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার হবু জামাইকে দেখছি না। তিনি কোথায়?”
দুর্গামোহনবাবু হাসলেন,
“সঞ্জয় ইউনিভার্সিটিতে গেছে। দুপুরেই চলে আসবে তখন ওকে দেখতে পাবেন। ওর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।“
খেয়ে উঠে দুর্গামোহনবাবু আমাকে বৈদেহীর ঘরে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নিয়ে গেলেন। বৈদেহী ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। ঘরের মেঝের ওপর কি যেন আঁকছে। দূর থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দুর্গামোহনবাবু বললেন, "বৈদেহী ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালোবাসে। ইদানীং পড়াশোনার চাপে ছবি আঁকাটা বন্ধ ছিল কিন্তু ওর এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার পর আবার আঁকার ইচ্ছেটা চেপেছে। যখনই ও একটু শান্ত স্বাভাবিক থাকে তখনই হাতে কোনও কিছু পেলেই সেটা দিয়ে মেঝেতে বা খাতায় আঁকতে শুরু করে। জানি না হঠাৎ মেয়েটার কী হল! যখন উন্মাদ অস্বাভাবিকের মতো আচরণ করে। তখন ওকে দেখে মনে হয় যেন ওর ভেতর কেউ ভর করেছে।"

দুর্গামোহনবাবু ডাকলেন বৈদেহীকে,

চড়াই পাখির নখের মতো সরু তুলাইপাঞ্জি চালের ভাত। দু'রকম তরিতরকারি, দুটো বড় বড় চিতল মাছের পেটি। কাঁসার জামবাটি ভর্তি মুরগির মাংস। আর পায়েস।

"মা এদিকে একবার উঠে আয় ঠাকুরমশাই এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে।"

দুর্গামোহনবাবুর কথা শুনে লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার কাছে এসে আমাকে প্রণাম করল। প্রণাম করে মুখটা তুলতেই ভালো করে দেখলাম তার মুখটা। সুন্দর চাঁদপানা মুখটা লালিত্যময় হয়ে রয়েছে। মানসিক উন্মাদনা গ্রাস করলেও লালিত্যটা তার মুখ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি।

আমি বৈদেহীর মাথায় দুই হাত রেখে বললাম, "বেঁচে থাকো মা বেঁচে থাকো। আপনার মেয়ের মুখখানা খুব সুন্দর দুর্গামোহনবাবু। একেবারে লক্ষ্মীমন্ত মুখখানা।"

আমি বৈদেহীর দিকে তাকিয়ে হাসলাম, "তুমি ছবি আঁকতে ভালোবাসো মা?"

"ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি।"

বৈদেহী স্বল্প বাক্যে উত্তর দিল। সাধারণত এইসময় মেয়েরা যখন শান্ত থাকে তখন খুব একটা বেশি কথা বলে না। মানসিক উন্মাদনা মানুষকে স্বল্পবাকে পরিণত করে। বৈদেহীর ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। আমি আমার ঝোলা থেকে একটা ছোট খাতার পাতা বের করে বৈদেহীর হাতে সেটা দিলাম।

"এর মধ্যে আমাকে একটা ছবি এঁকে দেখাও তো দেখি।"

বৈদেহী কাগজটার মধ্যে পেনসিল দিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা ছবি এঁকে ফেলল। পাতাটা আমার কাছে নিয়ে এসে আমার হাতে দিল সে। তারপর কোনও কথা না বলে নিজের মতো আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল।

ছবিটা ভালো করে দেখলাম আমি, একটি মহিলার ছবি। মহিলাটি বিধবা দেখতে কুৎসিত। মহিলাটির পাশে একটি কাক বসে আছে। মহিলাটির এক হাতে রয়েছে একটি কুলো ও অন্য হাতে বড়দা মুদ্রা। দেখে মনে হচ্ছে মহিলাটি কোনও দেবী।

দুপুরবেলা খেতে বসার সময় সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হল। ছোকরাকে দেখে মনে হল হাট্টাকাট্টা যুবক। বয়স ২৫ কি ২৬ হবে। সঞ্জয়কে যেন আমার চেনা ঠেকল। খাবারের পদ দেখে চোখ আমার রীতিমতো কপালে উঠল। চড়াই পাখির নখের মতো সরু তুলাইপাঞ্জি চালের ভাত। দু'রকম তরিতরকারি, দুটো বড় বড় চিতল মাছের পেটি। কাঁসার জামবাটি ভর্তি মুরগির মাংস। আর পায়েস।

আমি দুর্গামোহনবাবুকে বললাম, "আরে করেছেন কী! এতকিছু একসঙ্গে খাওয়া যায় নাকি?"

"এই ক'টা তো পদ মাত্র ঠাকুরমশাই বেশি আর কি করতে পারলাম। সবই ঘরে ছিল। সঞ্জয়ও আমাদের সঙ্গে দেখলাম খেতে বসেছে। সঞ্জয় খুব একটা বেশি কথা বলে না। তবুও আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

"তা সঞ্জয়, তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?"
"ওই চলছে ঠাকুরমশাই।"
"তা এরপর তুমি কি করতে চাও?"
আমি তো দুর্গাজ্যাঠামশাইকে বলেছিলাম যে আমাদের বিয়ে দিয়ে দিতে। পড়াশোনা তো বিয়ের পরও চালানো যেতে পারে। কিন্তু জ্যাঠামশাই বললেন, আগে পড়াশোনাটা শেষ করে চাকরি পেয়েই তারপর বিয়ে করতে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমার তো ব্যবসা করার ইচ্ছে। ভালো করে ব্যবসা করতে পারলে আয় প্রচুর।"
সঞ্জয়ের কথাবার্তা আমার খুব একটা ভালো লাগলো না। এত অল্প বয়সে বিয়ের জন্য এত তাড়া কিসের বাপু? একেই অন্যের উপর নির্ভর করে নিজের পড়াশোনা চালাচ্ছে তার ওপর এরই মধ্যে বিয়ের তাড়া।
খাওয়াদাওয়া শেষ করে সঞ্জয় গ্রামীণ পাঠাগারে পড়তে চলে গেল। আমি আর দুর্গামোহনবাবু খেয়ে উঠে বারান্দায় বসে তামাক টানতে টানতে গল্পেগুজবে মেতে উঠলাম।
কথা বলতে বলতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। আর ঠিক তখনই বৈদেহীর ঘরে সমস্ত জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দেওয়ার আওয়াজ আসতে লাগল। আমি আর দুর্গামোহনবাবু সঙ্গেসঙ্গে ছুটে গেলাম বৈদেহীর ঘরের দিকে দুর্গামোহনবাবু দরজা খুলতেই দেখি উন্মাদের মতো হাত-পা ছুড়ছে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে আর এদিক-ওদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।
দুর্গামোহনবাবু আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন,
"দেখছেন ঠাকুরমশাই, বৈদেহীকে কি আপনি দেখছেন? দেখুন মাঝে মাঝেই করে, এইরকম অবস্থা হয় ওর। এইসময় আমরা ওর কাছে যেতে সাহস পাই না ও কিছুক্ষণ পর নিজে থেকেই শান্ত হয়ে যাবে।"
আমি বৈদেহীর সামনে গিয়ে শান্তভাবে ওর মাথায় একটা হাত রাখলাম।
মনে মনে ঠাকুরের নাম জপ করলাম। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে মাটির মধ্যে লুটিয়ে পড়ল বৈদেহী। দুর্গামোহনবাবু এই ঘটনাতে এতটাই বিস্মিত হয়ে গেছিলেন যে, তার মুখ থেকে কোনও কথা বার হচ্ছিল না। তাঁকে দেখে মনে হল তাঁর মধ্যে যেন একটু আশার আলো দেখা গেছে। তিনি দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন,
"দেখলেন ঠাকুরমশাই। আপনি মাথায় হাত দিতে ও কেমন শান্ত হয়ে গেল। আমার মনে হয়, আপনিই পারবেন। আপনি একমাত্র পারবেন ওকে সুস্থ করে তুলতে। ওকে আবার আগের মতো স্বাভাবিক করে তুলতে।"
এক্ষেত্রে আমার ভূমিকাটা যে কোথায়, আমি সেটা বুঝলাম না। আমি কেবল ঠাকুরের নাম জপ করেছি মাত্র তাতেই শান্ত হয়ে গেছে বৈদেহী। তবে দুর্গামোহনবাবুর আশা যাতে ভেঙে না যায় তার জন্য আমি এই কথাটা তাঁকে বলতে গিয়েও বললাম না
সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে আমি মধুসুন্দরী দেবীর স্বপ্ন দেখলাম। আমি দেখলাম, কোথাকার এক পাহাড়ের চূড়ার উপর আমি ঘুমিয়ে আছি। আমার মাথায় এসে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মধুসুন্দরী দেবী। যেন হাত নয়, কোমল ফুলের পাপড়ি আমাকে স্পর্শ করছে। তাঁর সারা শরীর থেকে জুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি জেগে উঠে দেখলাম মধুসুন্দরী দেবীকে চোখের সামনে, অপূর্ব লাগছে। আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ মধুসুন্দরী দেবী পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। পাহাড় থেকে নেমে এলেন

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে আমি মধুসুন্দরী দেবীর স্বপ্ন দেখলাম। আমি দেখলাম, কোথাকার এক পাহাড়ের চূড়ার উপর আমি ঘুমিয়ে আছি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তিনি আমিও পাহাড় থেকে নেমে এসে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম। জঙ্গলের গাছের ডাল থেকে মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে মধুসুন্দরী দেবীর ডাক আর নূপুরের শব্দ। হঠাৎ আমার পিছন থেকে দুটো কোমল হাত আমার দু'চোখ চেপে ধরলেন। জুঁই ফুলের গন্ধটা যেন বেড়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে জানলার বাইরে মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙল আমার। আর চোখ খুলতে বিছানায় উঠে বসে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম সমস্ত ঘরটা ম ম করছে জুঁই ফুলের গন্ধে!

আমি দুর্গামোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আমার ঘর থেকে জুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে এল কি কর? ঘরে জুঁই ফুল রেখেছেন কি আপনি?"

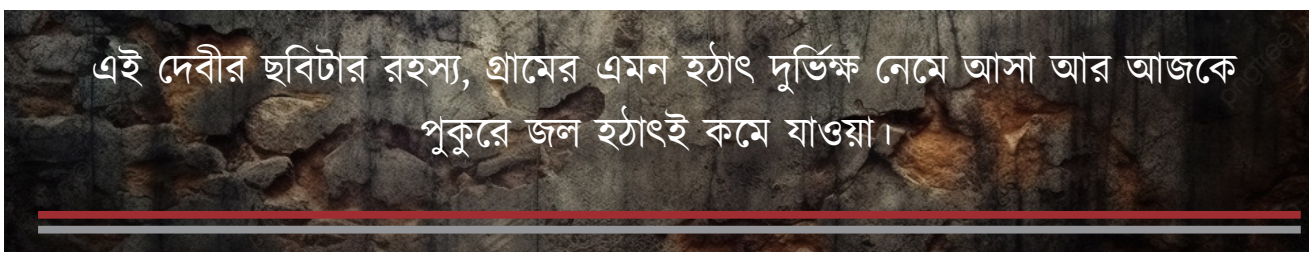

"কই না তো!"
আমি এ ব্যাপারে আর কথা বাড়ালাম না।

সকালে জলখাবার খেয়ে আমি দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে গ্রাম দেখতে বেরোলাম। কাল রাতে বৈদিহীর আর কোনও অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা যায়নি। গ্রামের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। দুর্ভিক্ষ যেন গোটা গ্রামটাকে শুষে নিয়েছে। একটা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি আর দুর্গামোহনবাবু। দুর্গামোহনবাবু বললেন,
"এই পুকুরটা হল ভাসান পুকুর। এই পুকুরে কেবলমাত্র ঠাকুর ভাসান করা হয়।"
প্রথমবার পুকুরটার দিকে যখন তাকিয়েছিলাম তখন দেখলাম পুকুরটা জলে ভর্তি। দুটো মোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে আবার পুকুরটার দিকে তাকাতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। দেখলাম পুকুরের জল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনেক কমে গেছে। অবাক হয়ে গেলাম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না আর বিশ্বাস করতে পারলাম না এইজন্য কারণ আমার পাশে দুর্গামোহনবাবু বলে চলেছেন,
"দেখছেন ঠাকুরমশাই পুকুরটা জলে ভরে আছে। বর্ষা না থাকলেও এই পুকুরের জল কখনও খালি হয় না।"
দুর্গামোহনবাবুর কথা শুনে মনে হল এই পুকুরের হঠাৎই জল কমে যাওয়ার দৃশ্যটা কেবলমাত্র আমার চোখেই পড়ছে অন্য কারওর চোখে পড়ছে না। এই ইঙ্গিত খুব একটা শুভ ইঙ্গিত নয়। সেদিন সারাদিন আমি এই চিন্তাধারাটি কেটে গেলাম।

দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। দুর্গামোহনবাবুর একে দেখে মনে হচ্ছিল উনি আমার অন্যমনস্কতা ধরতে পারলেও এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে চাইছেন না।আমার মস্তিষ্কে কিছু ঘটনা যেন একই সূত্রে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। দুর্গামোহনবাবুর মেয়ের বৈদেহীর এমন মানসিক অবস্থা, তার আকাশ এই দেবীর ছবিটার রহস্য, গ্রামের এমন হঠাৎ দুর্ভিক্ষ নেমে আসা আর আজকে পুকুরে জল হঠাৎই কমে যাওয়া। এই সমস্ত ঘটনাগুলি কেন জানি না মনে হচ্ছে বারবার একই সূত্রে গাঁথা। যেন একটার জট ছাড়াতে পারলেই সবক'টা জট নিজে থেকেই খুলে যাবে। সেদিন রাতে আমি আবার মধুসুন্দরী দেবীর স্বপ্ন দেখলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি গোটা ঘরে ম ম করছে জুঁই ফুলের গন্ধ!
সেদিন আমি দুর্গামোহনবাবুকে জানিয়ে নিজেই একটু গ্রামটা দেখতে বেরোলাম। উদ্দেশ্য একটাই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেই পুকুরটাকে গিয়ে দেখা। সেই পুকুরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার মন আরও উৎকণ্ঠায় ভরে গেল। পুকুরের জল আরও নেমে এসেছে। যেন কয়েক দিনের মধ্যেই পুকুরটা একেবারে শুকনো খটখটে হয়ে যাবে। দুর্গামোহনবাবুর বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম ললিতা দেবী রান্নাবান্না করছেন ওঁকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তা, হবু জামাইকে নিয়ে ব্যাংকের কোনও একটা কাজে গিয়েছেন।

বৈদেহীর ঘর থেকে তার আপন মনে বিড়বিড় করে চলার শব্দ আসছে। সেই ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা। বুঝতে পারলাম যে বৈদেহীর মানসিক উন্মাদনা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কাউকে কিছু না বলে আমি সোজা চলে গেলাম সঞ্জয়ের ঘরে।

সঞ্জয় ঘরে রয়েছে একটা খাট। সেই খাটে বিছানা পাতা। বিছানার এক পাশে লম্বা করে থরে থরে সাজানো আছে বই। সমস্ত পড়াশোনার বই। ঘরের এককোণে রাখা আছে একটা জলের কুঁজো। আর একটা পড়াশোনা করার জন্য টেবিল রয়েছে। এই টেবিলের সঙ্গে রাখা চেয়ারে বসেই সঞ্জয় পড়াশোনা করে। খাটের তলায় রয়েছে একটা টিনের বড় বাক্স। কি একটা মনে হতেই আমি সেই বাক্সটা বার করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সঞ্জয় ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরের দিন খুব ভোরবেলা উঠে আমি দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। ফিরলাম যখন, তখন সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। ললিতা দেবী রান্না করছেন। দুর্গামোহনবাবু সকালে বাড়ির তুলসীমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে ইষ্টনাম নাম জপ করছেন। আর সঞ্জয় ইউনিভার্সিটি যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। বারান্দায় বসেই নিজের হাতে ধরা বই-খাতাগুলো ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে। আমাকে দেখে দুর্গামোহনবাবু বললেন,

"আরে ঠাকুরমশাই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আপনি নেই! সকাল সকাল বেরিয়েছেন কোথায়?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি উত্তর দিলাম,

"সুতানুটি গ্রামে। আমার কথায় সকলেই অবাক হল আর সবথেকে বেশি অবাক হল সঞ্জয়। তাকে দেখে মনে হল মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও বোধহয় মানুষকে এত অবাক দেখায় না। আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয়ের সারা শরীর ঘেমে উঠেছে।

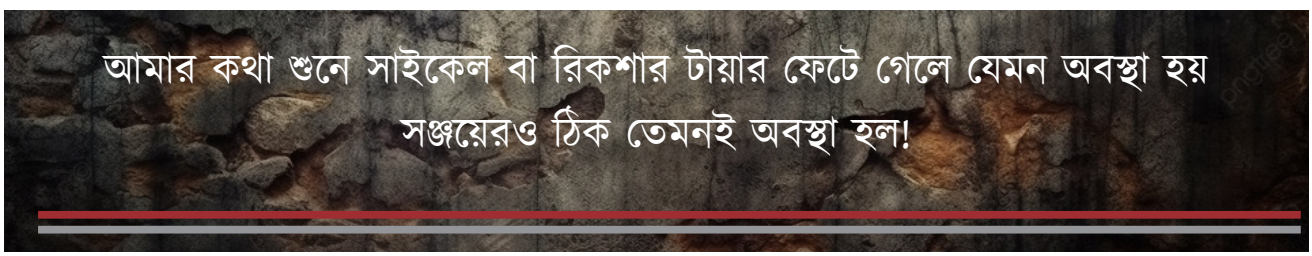

"সুতানুটি গ্রাম। সুতানুটি গ্রামে আপনি গিয়েছিলেন কেন?"

সঞ্জয় রীতিমতো থতমত খেয়ে আমাকে প্রশ্নটা করল।

"সুতানুটি গ্রামে গিয়েছিলাম কঙ্কাবতীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে।"

আমার কথা শুনে সাইকেল বা রিকশার টায়ার ফেটে গেলে যেমন অবস্থা হয় সঞ্জয়েরও ঠিক তেমনই অবস্থা হল!

হোঁচট খেতে খেতে সঞ্জয়ের মুখ থেকে কথা বেরোলো,

"ক ক... কঙ্কাবতী! কে কঙ্কাবতী?"

দুর্গামোহনবাবু বললেন,

"কে এই কঙ্কাবতী?"

"কঙ্কাবতী কে? সেটা আপনার হবু জামাইকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

"সঞ্জয়! সঞ্জয় কি করে জানবে কঙ্কাবতী কে! ও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কি কঙ্কাবতীকে চেনে নাকি?"
আমি এবার সরাসরি সঞ্জয়ের চোখে চোখ রেখে বললাম,
"কি হে সঞ্জয় তুমি তো কঙ্কাবতীকে চেনো তাই না?"
সঞ্জয় আমতা আমতা করে বলল,
"কে কঙ্কাবতী। আমি কোনও কঙ্কাবতীকে চিনি না।"
"তাই। সত্যিই তুমি কঙ্কাবতীকে চেনো না? ঠিক আছে তাহলে কঙ্কাবতী নিজে এসেই বলুক যে সে তোমায় চেনে কিনা।"
এসো মা ভেতরে এসো, এসো দেখে যাও তোমার শয়তান স্বামীকে।"
দুর্গামোহনবাবুর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কঙ্কাবতী। দুর্গামোহনবাবুর সমস্ত বাড়িখানা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলে এতক্ষণ কারওর চোখে পড়েনি তাকে। এবার কঙ্কাবতী পাঁচিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির ভেতরে ঢুকে উঠোনে এসে দাঁড়াল।
এতক্ষণে ললিতা দেবীও রান্না বন্ধ করে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।
কঙ্কাবতীর চোখ দিয়ে রাগ ঠিকরে বেরোচ্ছে। সঞ্জয় দিকে তাকিয়ে সে বলে চলেছে,
"তুমি মানুষ না জানোয়ার। আমাকে বিয়ে করে সংসার করার পর আমার বাপেরবাড়ির সমস্ত সম্পত্তি নিজে কুক্ষিগত করে এখানে আরেকটা মেয়ের জীবন বিপন্ন করতে এসেছ। আমি আরেকটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে তোমাকে দেব না।"
দুর্গামোহনবাবু হতবাক হয়ে গেছেন!
"এসব কি হচ্ছে? সঞ্জয় তোমার স্বামী! ওর বিয়ে হয়ে গেছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"
আমি দুর্গামোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম,
"একটু দাঁড়ান এক্ষুনি সবকিছু বুঝতে পারবেন।"
দেখলাম, দুর্গামোহনবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ললিতা দেবী। আমি আমার ঝোলা থেকে একটা ছবি বার করে দুর্গামোহনবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলাম। দুর্গামোহনবাবু ছবিগুলো দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন! তাঁর মুখ থেকে যেন কথা বেরোনো বন্ধ হয়ে গেছে। ছবিগুলো সঞ্জয় আর কঙ্কাবতীর বিয়ের ছবি। ইতিমধ্যে দুর্গামোহনবাবু ললিতা দেবীর হাতে ছবিগুলো ধরিয়ে দিলেন। ছবিগুলো দেখে তিনিও যেন নির্বাক নিশ্চল হয়ে গেছেন।
সঞ্জয় বইপত্র বারান্দায় রেখে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। তাকে দেখে মনে হল সে পালাবার মতলব আঁটছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার কথা সত্যি করে দিয়েই সঞ্জয় দৌড়ে পালাতে গেল কিন্তু উঠোনের বাইরে গেটের সামনে আসা মাত্রই ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে

কথা সত্যি করে দিয়েই সঞ্জয় দৌড়ে পালাতে গেল কিন্তু উঠোনের বাইরে গেটের সামনে আসা মাত্রই ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। যেন কোনও এক অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে। শোঁ শোঁ শব্দ করে হাওয়া বইছে, ঝড় ওঠার আগে যেমন থমথমে হয়ে যায় জায়গাটা পরিবেশটা ঠিক এখন সেরকম মনে হচ্ছে। কোথা থেকে কয়েকটা কাক উড়ে এসে দুর্গামোহনবাবুর বাড়ির উঠোনে এসে বসল। তারপর তারস্বরে ডাকতে লাগল।
হঠাৎ বৈদেহীর ঘরের দরজাটায় দড়াম দড়াম শব্দ হতে শুরু করল। দরজার ওপাশে ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে মেয়েলি হুংকার। মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙে গেল তালা বন্ধ ঘরের দরজা এবং ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বৈদেহী। কিন্তু এ কোন বৈদেহীকে দেখছি। আমি এবং বাকিরা সকলে দেখলেও বৈদেহীর মাথার চুল ধবধবে সাদা সেগুলো উড়ছে পরনে একটা সাদা বিধবার পোশাক।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হুংকার দিতে দিতে সঞ্জয়ের উদ্দেশে সে বলে চলেছে,

"পাপী শয়তান তোর পাপের ঘড়া আজ পূর্ণ হয়েছে। মৃত্যুই তোর একমাত্র শাস্তি। আমার শুধু মানসিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সকলের অগোচারে তুই আমাকে দিনের পর দিন ভোগ করেছিস। শুধু আমি নয়, আরেকটা মেয়েরও তুই সর্বনাশ করেছিস। তোর মৃত্যু অবধারিত।"

সঞ্জয় যেন পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছে। সে যেন কোনও এক অদৃশ্য জাদুবলে নড়বার শক্তি হারিয়েছে।

বৈদেহী উঠোনের একপাশে রাখা নারিকেল পাড়ার দা হাতে নিয়ে দৌড়ে গেল সঞ্জয়ের সামনে তারপর সজোরে চালিয়ে দিল সেই দা-টি। চোখের সামনে ঘটে গেল এক ভয়াবহ কাণ্ড। এহেন ঘটনার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। দায়ের এককোপে সঞ্জয়ের ধড় থেকে মাথাটা খসে পড়ল। কাটা কলাগাছের মতো সঞ্জয়ের ধড়টা লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে রক্তে ভেসে গেল গোটা উঠোন। কঙ্কাবতীর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না দৌড়ে স্বামীর মৃতদেহের সামনে গিয়ে ধপ করে উঠোনে বসে পড়ল। তারপর ভেঙে পড়ল বুকফাটা কান্নায়। আমি এগিয়ে গিয়ে কঙ্কাবতীর মাথায় হাত রাখলাম, তাকে সান্ত্বনা দিলাম। ওকে বোঝালাম বিপথগামী স্বামীর জন্য চোখের জল ফেলতে নেই। কিন্তু আমি জানি যতই খারাপ মানুষ ছিল না কেন সঞ্জয়, সে তো আসলে কঙ্কাবতীর স্বামী। কঙ্কাবতী তো তাকে স্বামী হিসেবে অস্বীকার করতে পারে না। দুর্গামোহনবাবুর বাড়িতে যথারীতি হল পুলিশের আগমন মৃতদেহ সৎকার করে বৈদেহীকে তারা আদালতে উপস্থিত করল। দুর্গামোহনবাবু মেয়ের হাজতবাসের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, "চিন্তা করবেন না আপনার মেয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে।"

বিধির বিধানের খেলায় আমার কথাটাই সত্য প্রমাণিত হল। বৈদেহী মুক্তি পেয়ে গেল। একজন মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না কোনওমতেই।

এই সমস্ত ব্যাপার মিটে যাওয়ার পর একদিন আমি বৈদেহীকে ওর নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালাম। আমি খানিকক্ষণ পর কিছু মন্ত্র পড়া শুরু করতেই দেখলাম, কিছুক্ষণ পর বৈদেহী উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বসলো ঠিক যেমন বৈদেহী তার ছবিতে সেই দেবী যেভাবে বসেছিল, ঠিক সেরকম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দু'চোখ থেকে দুটো জ্যোতি বেরিয়ে তীব্র বেগে আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করল। আমি দেখলাম, চোখের সামনে বৈদেহীর অচৈতন্য দেহটা মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আমি পাঁজাকোলা করে বৈদেহীকে নিয়ে ঘরের বাইরে বার হলাম বাইরে দুর্গামোহনবাবু ললিতা দেবী মেয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে চিন্তা করছিলেন।

আমি পাঁজাকোলা করে বৈদেহীকে নিয়ে ঘরের বাইরে বার হলাম বাইরে দুর্গামোহনবাবু ললিতা দেবী মেয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে চিন্তা করছিলেন। আমি ওঁদের সবাইকে আশ্বস্ত করে বৈদেহীকে নিজের ঘরের বিছানার মধ্যে শুইয়ে দিলাম। দু'দিনের মধ্যে বৈদেহী একবারে স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে গেল। সুস্থ হওয়ার পর আর মাত্র এক সপ্তাহ আমি সেখানে ছিলাম। দুর্গামোহনবাবু ঠিক করেছিলেন, আমি আর উনি একসঙ্গে যাত্রা করব। আমি চলে যাব আমার নিজের বাড়ি আর দুর্গামোহনবাবু ফিরে যাবেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে। যাওয়ার দিন ললিতা দেবীকে বিদায় জানিয়ে আমি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আর দুর্গামোহনবাবু একটা হাতেটানা রিকশায় স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। এই পর্যন্ত বলে থামলেন তারানাথ।

কিশোরী ব্যস্তবাগীশ হয়ে বলল,

"এই পুরো গল্পটা তো আপনাকে কেন্দ্র করেই হল। এতে মধুসুন্দরী দেবী কোথায়? মধুসুন্দরী দেবীকে নিয়ে আপনি যে বললেন গল্প বলবেন।"

"তোমাদের এই যুগের ছেলেদের হয়েছে এক সমস্যা। তোমরা একটুও ধৈর্য ধরতে জানো না। রোসো কিশোরী রোসো।"

আমি বললাম,

"আপনি ওর কথা বাদ দিন তো আপনি বলুন।"

তারানাথ আবার বলা আরম্ভ করল।

স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে আমি দুর্গামোহনবাবুকে রিকশায় সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম,

"দুর্গামোহনবাবু আপনার মেয়ে বৈদেহী এ জন্মে অনেক পুণ্য করেছে। বা এটা ওর গত জন্মের পুণ্যের ফল বলতে পারেন। এটা আপনার মেয়ের মধ্যে যে অস্বাভাবিক আচরণগুলো দেখছিলাম সেগুলো আসলেই দেবী ধূমাবতীর প্রভাব। আপনার মেয়ের শরীরে ধূমাবতীর একটা অংশ প্রবেশ করেছে। এই দেবী ধূমাবতী দশমহাবিদ্যার এক দেবী। ইনি তান্ত্রিক হিন্দু দেবী। এই দেবীকে আমরা ছবিতে দেখি যে দেবী কাকের পিঠে বসে আছেন অর্থাৎ কাক হল দেবীর বাহন। এই দেবীর পরনে সাদা শাড়ি অর্থাৎ এই দেবী বিধবা। এই ধূমবতী হল সপ্তম মহাবিদ্যা।এই দেবীর প্রভাব সকলের সহ্য হয় না আপনার মেয়েরও তাই হয়েছে যখনই ধূমাবতীর প্রভাবটা জেগে উঠত তখনই আপনার মেয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করত। দেবী ধূমাবতীর প্রভাবেই গ্রামে দুর্ভিক্ষ নেমেছিল। কথিত আছে দেবী ধূমাবতী যেখানে আসেন সেখানে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। আপনার মেয়ে বৈদেহী যে ছবিগুলো আঁকছিল সেগুলো ধূমাবতীর ছবি। আমি প্রথমে এই দেবীকে চিনতে পারিনি পরে চিনতে পারি এবং নিশ্চিত হই যে বৈদেহীর শরীরে দেবী ধূমাবতীর একটা অংশ স্থাপিত হয়েছে। সঞ্জয়ের হাবভাব আমার প্রথম থেকেই একটু অদ্ভুত লাগছিল। ওকে প্রথমে দেখি আমার চেনা চেনা মনে হয়েছিল। পরে মনে পড়ল, একবারও ওর বাড়ির আত্মীয় আমার কাছে ওর বিয়ের জন্য কোষ্ঠী বিচার করতে এসেছিল। সেইসময় আমি ওর ছবি দেখেছি। কঙ্কাবতীর সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার জন্য কোষ্ঠী বিচার করিয়েছিল। ওকে সন্দেহ করতে শুরু করি আস্তে আস্তে আমার সন্দেহটা সত্যি হয়। সঞ্জয় আপনার মস্ত বড় সম্পত্তি হাতানোর জন্য আপনার মেয়েকে বিয়ে করার নাটক করে। আপনি তাকে সুপাত্র ভেবে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দেন। এমনকী তার পড়াশোনারও ব্যবস্থাও করে দেন। আপনার মেয়ের সঙ্গে সঞ্জয় দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ হয়। আমি সেটার প্রমাণ পেয়েছি সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একদিন সঞ্জয়ের গা থেকে আপনার মেয়ের মাখা সুগন্ধি আতরের গন্ধ পেয়েছি। দুজনে দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ হলে তবেই একজনের শরীরের আতরের গন্ধ অন্যজনের গায়ে লাগে। সঞ্জয় বদমাইশটা আগে একটা বিয়ে করেছে। বউয়ের নাম কঙ্কাবতী। একদিন সঞ্জয়ের ঘরে ঢুকে আমি একটা জিনিস খুঁজি। সৌভাগ্যবশত কিছুক্ষণ খোঁজার পরেই আমি সেই জিনিসটা খুঁজে পেতে সফল হই। জিনিসটা আর কিছু নয়, সঞ্জয় এবং তার স্ত্রীর কঙ্কাবতীর একটা ছবি। আমি এমনই কিছু প্রমাণ খুঁজছিলাম। ছবিটা বড় কায়দা করে তার টিনের ট্রাঙ্কের এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে

আমি সেটার প্রমাণ পেয়েছি সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একদিন সঞ্জয়ের গা থেকে আপনার মেয়ের মাখা সুগন্ধি আতরের গন্ধ পেয়েছি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রেখেছিল যেখান থেকে খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। আমি সেটা ভগবানের আশীর্বাদে পেয়েও যাই। পরের দিন ভোরবেলায় আমি বেরিয়ে গিয়ে কঙ্কাবতীকে সবকিছু জানাই। কঙ্কাবতী হতবাক হয়ে যায়! নিজের স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল কিন্তু আমি কঙ্কাবতীকে আমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে এসে জলজ্যান্ত প্রমাণ করে দিই। প্রমাণ করে দিই যে ওর স্বামী কতটা দুশ্চরিত্রের। তার পরের সমস্ত ঘটনা তো আপনি সবকিছুই জানেন। আমার কথাগুলো সব কিছু বলে ফেলা সত্ত্বেও দুর্গামোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর শরীরে কোনও পরিবর্তন নেই। তিনি একেবারে নির্বিকার শান্ত হয়ে বসে আছেন। রিকশা থেকে নেমে এসে স্টেশনে দাঁড়ালাম।

শরীরটা বদলে একটা স্ত্রীর রূপ ধারণ করল। এই স্ত্রী লোককে আমি সারা জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্ত্রীলোকের জন্য আমি উন্মাদ আমার সারাটা জীবনই এই স্ত্রীলোকের প্রভাব থেকে যাবে। ইনি আমার স্বপ্নচারিণী। ইনি আর কেউ নন মধুসুন্দরী দেবী। আমি যেন সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি ওঁকে এভাবে দেখতে পাব সেটা কল্পনাও করিনি কোনওদিন। আমার মুখ থেকে শুধুমাত্র একটা কথাই বেরোলো, "আপনি," দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

মধুসুন্দরী দেবী আমাকে বললেন,
"এতদিন আমি তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম তারানাথ। দেখছিলাম তোমার সাধনা কতটা সফল হয়েছে তুমি কতটা তোমার তন্ত্রশক্তি দিয়ে

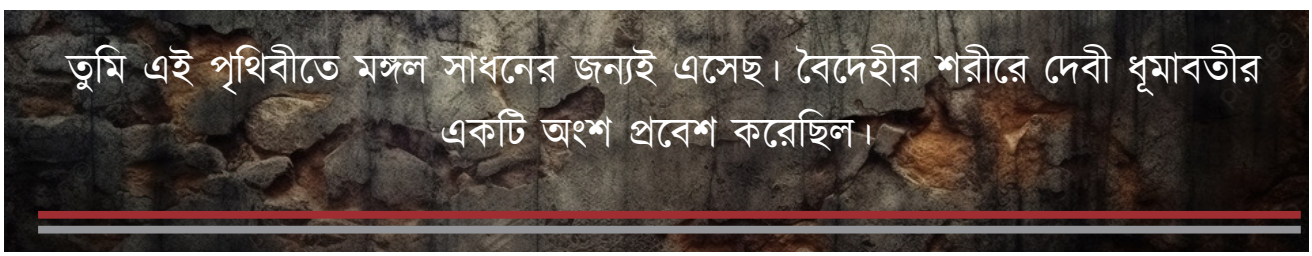

দুর্গামোহনবাবু হঠাৎ একটা আঙুল তুলে ইশারা করলেন আর আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। দেখলাম আমার চারিদিকে লোক আর হঠাৎ থেমে গেছে। দূরে একটা ট্রেন আসছিল সেটা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। চারপাশের মানুষজন যে যেরকম অবস্থায় ছিল সে যেন সে রকম অবস্থাতেই আটকে গেছে। সচল এবং জীবন্ত রয়েছে কেবল আমি আর দুর্গামোহনবাবু।

দুর্গামোহনবাবু বললেন, "আমায় তুমি চিনতে পারছ না তারানাথ?"

কথাগুলো উনি একদম আমার সামনে বলছেন কিন্তু যেন মনে হচ্ছে কথাগুলো ভেসে আসছে বহু দূরে কোনও পাহাড়ের পাথরের পাঁজর থেকে। কথাটা বারবার প্রতিফলিত হচ্ছে চারিদিকে!

আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে, "কে আপনি?"

আমার প্রশ্নের সঙ্গেসঙ্গেই দুর্গামোহনবাবুর শরীরটা দেখলাম বদলে যেতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে

মানুষের উপকার করতে পেরেছ। আজ আমার সমস্ত বিশ্বাস এক জায়গায় থেমেছে আমি বুঝেছি তোমার দ্বারা মানুষের শুধু মঙ্গলই হবে। তুমি এই পৃথিবীতে মঙ্গল সাধনের জন্যই এসেছ। বৈদেহীর শরীরে দেবী ধূমাবতীর একটি অংশ প্রবেশ করেছিল। বৈদেহী তো সাধারণ মানুষ তাই এই দেবীর অলৌকিক অপার্থিব ক্ষমতা সে সহ্য করতে পারেনি।

অলৌকিক ক্ষমতা সে সম্পূর্ণ নিতে পারিনি। সেইজন্যই বৈদেহীকে সুস্থ করার জন্য আমি তোমাকে খবর দিই। ভাবলাম এই সুযোগে তোমার পরীক্ষা নেওয়া হয়ে যাবে। আর সঞ্জয়ের অপরাধ তুমি খণ্ডন করবে। যেদিন তোমার সঙ্গে আমার স্টেশনে দেখা হল সেদিন জানতাম যে তুমি স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকবে ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার জন্য। আমি তাই দুর্গামোহনবাবুর ছদ্মবেশে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হই। সেদিন তুমি সঞ্জয়ের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ঘরে ছবি খোঁজ করতে ঢুকেছিলে সেটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছায়। তুমি যাতে সঞ্জয়ের ঘরে ঢুকতে পারো তার জন্য সেদিনকে আমি সঞ্জয়কে আমার নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলাম। দুর্গামোহনবাবু আসলে তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে এখানে এই ক'দিন এখানে আসেনি। তিনি তাঁর নিজের জায়গাতেই আছেন। বৈদেহীর এই অবস্থা দেখে যখন দুর্গামোহনবাবুর স্ত্রী ললিতা দেবীকে চিঠি লিখে পাঠান তখন সেই চিঠিটা আসলে দুর্গামোহনবাবুর কাছে পৌঁছয়। কিন্তু আমার সেইসময় প্রয়োগ করা কিছু ক্ষমতায় দুর্গামোহনবাবু মাথা থেকে চিঠির পড়া সমস্ত ঘটনার কথা সম্পূর্ণ উড়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ ভুলে যান চিঠির কথা। দুর্গামোহনবাবু এখানে আসতেই ভুলে যান। তিনি তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রেতেই আছেন। এই যে আমি এখন চলে যাব। আমি চলে যেতেই দুর্গামোহনবাবুর আবার সব কথা মনে পড়ে যাবে। কিন্তু এই ক'টা দিন আমি এখানে কাটিয়েছি দুর্গামোহনবাবুর ওখানে থাকলেও মনে হবে তিনি যেন এই ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে গেছেন। এই ক'দিনের সমস্ত ঘটনা আসল দুর্গামোহনবাবুর মাথায় গেঁথে গেছে।

আমার মুখ থেকে আবার কথা বেরোলো,
"মধুসুন্দরী দেবী আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"
মধুসুন্দরী দেবী আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন,
"আমি জানি তারানাথ তুমি আমাকে কি বলতে চাও তুমি আমায় ভালোবাসো। তোমার মতো স্বামী পেলে আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে। আমি যদি কোনওদিন মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করি তবে তোমাকে আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব।"
আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম। বললাম,
"আমি আপনার জন্য আবার জন্ম নেব আপনাকে আমি আমার স্ত্রী হিসেবে পূজা করতে চাই মধুসুন্দরী দেবী।"
"তোমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে তারানাথ। একদিন পূর্ণ হবেই। কারণ এটা তোমার ইচ্ছা নয়, এটাই তোমার সাধনা।"
কথা শেষ করে মধুসুন্দরী দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটা ধোঁয়ার মধ্যে যেন মিশে গেলেন তিনি। আমি দেখলাম আমার চারপাশে সবকিছু আবার আগের মতোই সচল হয়ে গেছে। মানুষজন যেন আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমার ট্রেন এসে পড়েছে সামনে। আমি ট্রেনে উঠে পড়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

গল্প শেষ করে তারানাথ থামল।
আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত ন'টা বাজে।
তারানাথকে বললাম,
"এবার উঠতে হবে তারানাথ। কাল সকালে আবার অফিস আছে।"
আমি আর কিশোরী বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারানাথ আমাদের ছাড়তে রাস্তায় এল। কিশোরী তার বাড়ির পথে হাঁটা দিল। আমি আমার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার পিঠে হাত রাখল তারানাথ।
আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে বললাম,
"তারানাথ কি হল তুমি কিছু বলবে?"
তারানাথ বলল,
"আজ সকালে তোমার স্বপ্নে অমর জীবন এসেছিল তাই তো। সে বারবার মধুসুন্দরী দেবীর নাম করছিল। তাই তোমার আজকে মধুসুন্দরী দেবীর গল্প শোনায় তোমার এত আগ্রহ ছিল।"
আমি হতবাক হয়ে গেলাম,
"এই কথা তুমি কি করে জানলে তারানাথ আমি তো এই কথা কাউকে বলিনি। এমনকি কিশোরীকে পর্যন্ত নয়"।
তারানাথ একগাল হাসলো
"কি করে জানলাম? সবই আমার স্বপ্নচারিণী মধুসুন্দরী দেবীর কৃপায়।"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভগবতী রূপে জগদ্ধাত্রী, মা সারদা এবং পুরাণকথা

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজা

জগৎকে ধারণ করেন যিনি, তিনিই জগদ্ধাত্রী। ইনি দেবী দুর্গার অপর রূপ। উপনিষদে তার নাম উমা হৈমবতী। দেবী দুর্গার বাহন সিংহ যেমন মহিষের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে, জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহ দাঁড়ায় হাতির উপরে। সংস্কৃতে হাতির অপর নাম করী। কথিত আছে, দেবী জগদ্ধাত্রী করী বা হস্তিরূপী অসুর করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তাই তাঁকে বলা হয় করীন্দ্রাসুরনিসূদিণী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত তেজপুঞ্জ থেকে সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা এই দেবীর জন্ম। জগদ্ধাত্রীর চার হাতের উপরের দুটোয় থাকে চক্র ও শঙ্খ এবং নীচের দুটোতে পঞ্চবাণ ও ধনুক। শাস্ত্র মতে, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে হয় জগদ্ধাত্রীর পুজো। দেবীর এই মূর্তির রূপকল্পনা করেন চৈতন্য-পরবর্তী শাস্ত্রকার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। মা কালীর মতো জগদ্ধাত্রী মূর্তিরও একটি রূপবর্ণনা তিনি তাঁর তন্ত্রসার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান। সেই রূপ অনুসারে তৈরি মূর্তির পুজোই হয় বাংলায়।

জগদ্ধাত্রী পুজোর নিয়মটি একটু স্বতন্ত্র। দুটি প্রথায় এই পুজো হয়ে থাকে। কেউ কেউ সপ্তমী থেকে নবমী অবধি দুর্গাপুজোর ধাঁচে জগদ্ধাত্রী পুজো করে থাকেন। আবার কেউ কেউ নবমীর দিনই তিন বার পুজোর আয়োজন করে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজো সম্পন্ন করেন। এই পুজোর অনেক প্রথাই দুর্গাপুজোর অনুরূপ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দেবীবাহন সিংহের পদতলে করীন্দ্রাসুর

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা

চন্দননগরে কীভাবে প্রচলন হল এই পুজোর?

জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য বিখ্যাত চন্দননগর। চন্দননগরের গঙ্গাপাড়ের প্রথম পুজো চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রীপুজো বা আদি মায়ের পুজো। কিন্তু জানেন কি, কীভাবে শুরু হয়েছিল এই পুজো?

লোকমুখে শোনা যায়, তৎকালীন ফরাসিদের দেওয়ান ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তিনি ছিলেন আবার নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নবাব আলিবর্দির রাজত্বকালে মহাবদজঙ্গ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছে বারো লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করেন। নজরানা দিতে অক্ষম হলে নবাব রাজাকে বন্দি করে নিয়ে যান। কারাবন্দি থাকার কারণে দুর্গাপুজো করতে পারেননি রাজা। কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর বিজয়া দশমীর দিনে নৌকায় ফেরার পথে তিনি সিংহবাহনা এক দেবীর স্বপ্নাদেশ পান। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় পরের মাসের শুক্লাপক্ষের নবমীর তিথির সময় জগদ্ধাত্রী দেবীর পুজোর আয়োজন করার জন্য। সেইমতো চন্দননগরের গঙ্গাপাড়ের নিচুপট্টি, চাউলপট্টি এলাকায় নৌকা থামিয়ে এই পুজোর আয়োজন করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তাকে সহযোগিতা করেন বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। অল্প সময়ে মধ্যে পুজো আয়োজন করার জন্য মহিলাদের বাদ দিয়ে চাউলপট্টি এলাকার সমস্ত ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসেন পুজোর জন্য। শুরু হয় প্রথম জগদ্ধাত্রীপুজোর। প্রথম পুজো থেকেই ওই পুজো সংকল্প হয়ে আসে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পরিবারের সদস্যদের নামে।আগে তাঁরা এই পুজোয় যোগ দিলেও, এখন আর এই পুজোতে আসেন না। এখনও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি রয়েছে চন্দননগরের সরিষাপাড়ায়। তবে তা জরাজীর্ণ অবস্থায়। সেখানে তার উত্তরসূরিরা বাস করেন। শোনা যায়, পরের বছর থেকেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবী প্রতিমার আরাধনা শুরু করেন নিজের রাজ বাড়িতেও।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কৃষ্ণনগরের বুড়িমা

কীর্ণাহারে 'মান সিংহে'র গৃহদেবী অষ্টধাতুর জগদ্ধাত্রী

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো:

১৭৭২ সালে রাজবাড়ির দেখাদেখি কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়ায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রজারা জগদ্ধাত্রীপুজো শুরু করেন। বুড়িমার পুজো নামে পরিচিত এই পুজো শুরু হয়েছিল ঘটে ও পটে। প্রথম দিকে স্থানীয় গোয়ালারা দুধ বিক্রি করে এই পুজোর আয়োজন করতেন। ১৭৯০ সাল নাগাদ গোবিন্দ ঘোষ ঘট-পটের পরিবর্তে প্রতিমায় জগদ্ধাত্রীপুজোর সূচনা করেন। এখানকার প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হল প্রায় সাড়ে সাতশো ভরি সোনায় গয়নায় দেবী প্রতিমার অলংকারসজ্জা।

শান্তিপুরে জগদ্ধাত্রী পুজো:

এই কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ছিলেন গিরীশচন্দ্র রায়। তিনি নদীয়ার শান্তিপুরের কাছে ১০৮ ঘর ব্রাহ্ম পরিবারকে থাকতে দিয়ে একটি গ্রামপত্তন করেন যার নাম 'ব্রহ্মশাসন'। তারপর থেকে শুরু হয় শান্তিপুরে জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রচলন। কথিত আছে, শান্তিপুরের সূত্রাগড়-এর পিরের হাট এলাকায় প্রথম জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রচলন করা হয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে, সেই কারণে এখনও সেখানে প্রতিটি পুজোয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে সংকল্প করা হয়।

মা সারদার জগদ্ধাত্রী রূপ:

তাঁর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একবার ভাগ্নে হৃদয়কে স্বয়ং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন, "এঁর ভিতর যে আছেন, তিনি ফোঁস করে উঠলে ত্রিভুবনে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ও সারদা, সাক্ষাৎ স্বরস্বতী।"

মা নিজের মুখেই তাঁর যে জন্মবৃত্তান্তটি বলেছেন ভক্তদের, "আমার মা শিওড়ে ঠাকুর দেখতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জয়রামবাটীর জগদ্ধাত্রী

শান্তিপুরের ব্রহ্মচারী পরিবারের জগদ্ধাত্রী পূজা

গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় হঠাৎ শৌচে যাওয়ার ইচ্ছা হওয়ায় দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হলো না, কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদরমধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন লাল চেলি পরা একটি পাঁচ-ছ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি পিঠের দিক থেকে তাঁর গলায় জড়িয়ে ধরে বলল, আমি তোমার ঘরে এলাম মা। তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে; তা থেকেই আমার জন্ম।"

শ্রী মা সারদার জন্মের আগে তাঁর মা শ্যামসুন্দরী দেবী স্বপ্নাদেশ পান। চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবী একটি পা তুলে বসে আছেন। শ্যামসুন্দরী দেবীকে আদেশ করেছিলেন জগদ্ধাত্রীপুজো শুরু করার জন্য।

জয়রামবাটীর জগদ্ধাত্রীপুজো:

বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহধর্মিণী সারদা দেবীর জন্মভিটার জগদ্ধাত্রীপুজো বিশেষ প্রসিদ্ধ। পুজো উপলক্ষে জয়রামবাটীতে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। সারদা দেবীর পৈতৃক বাড়িতে এই পুজোর আয়োজন করে রামকৃষ্ণ মিশন। ১৮৭৭ সালে সারদা দেবীর পিতৃগৃহে প্রথম জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করেছিলেন তার জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী। কিংবদন্তি, প্রতি বছর শ্যামাসুন্দরী দেবী প্রতিবেশী নব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির কালীপুজো উপলক্ষে নৈবেদ্যের চাল পাঠাতেন। ওইবছর কোনও বিবাদের কারণে নব মুখোপাধ্যায় চাল নিতে অস্বীকার করেন। নৈবেদ্যদানে অসমর্থ হয়ে শ্যামাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত মর্মাহত হন। সেই রাতেই তিনি দেবী জগদ্ধাত্রীকে স্বপ্নে দেখেন এবং তার স্বপ্নাদেশে ওই চালে জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করেন। প্রথম বছর বিসর্জনের দিন বৃহস্পতিবার ছিল। তাই সারদা দেবী লক্ষ্মীবারে বিসর্জনে আপত্তি করেছিলেন। পরদিন সংক্রান্তি ও তার পরদিন মাস পয়লা থাকায় ওই দুই দিনও বিসর্জন দেওয়া যায়নি। বিসর্জন হয় চতুর্থ দিনে। আরও কথিত আছে যে, পরের বছর সারদা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

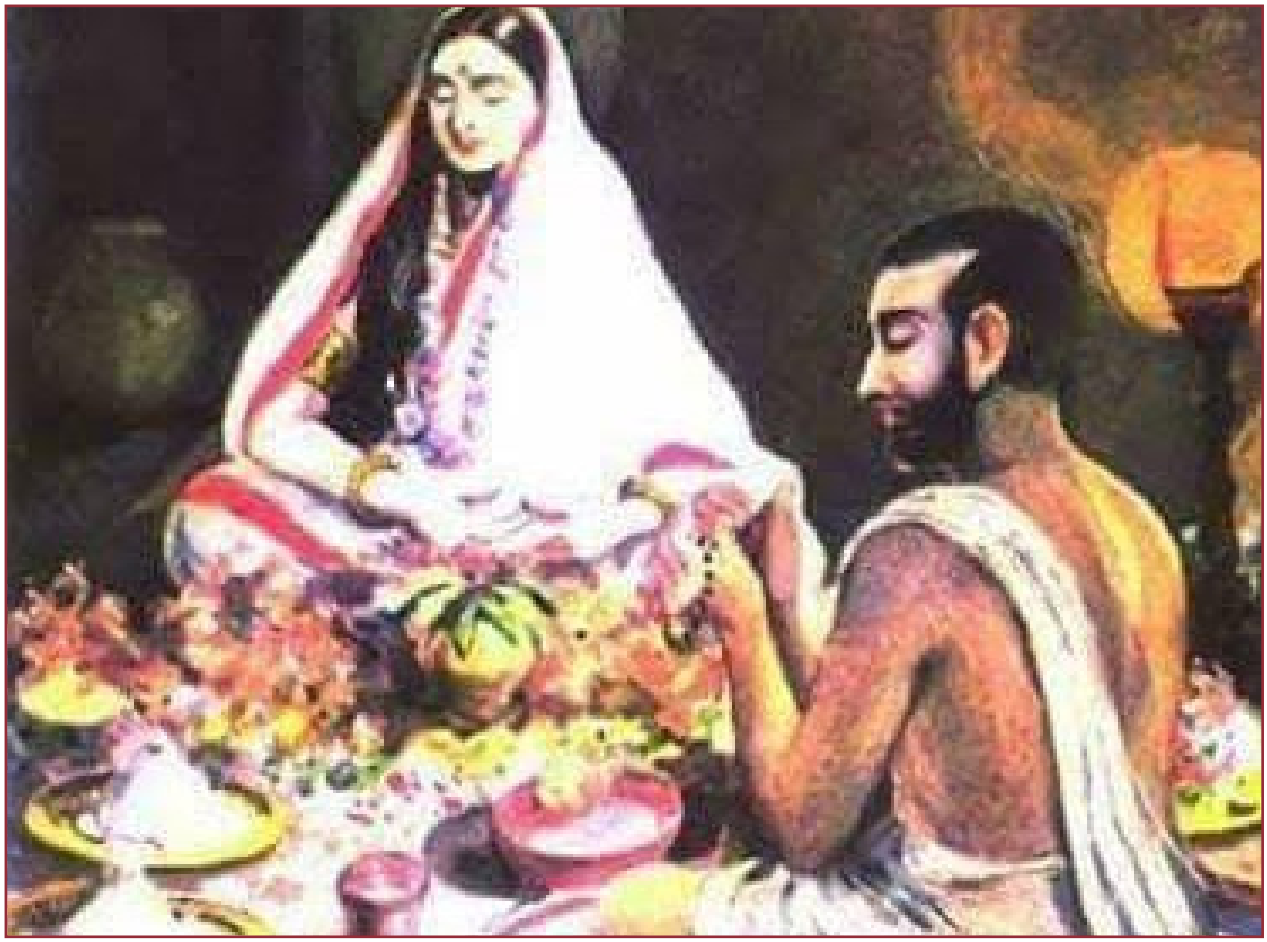

দেবী জগদ্ধাত্রীপুজো বন্ধ করে দিতে চাইলে দেবী জগদ্ধাত্রী তাঁকে স্বপ্নাদেশে পুজো বন্ধ করা থেকে নিরস্ত করেন। এরপর প্রথম চার বছর পুজো হয়েছিল শ্যামাসুন্দরী দেবীর নামে; দ্বিতীয় চার বছর সারদা দেবীর নামে এবং তৃতীয় চার বছর তার কাকা নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নামে। বারো বছর পর সারদা দেবী পুনরায় পুজো বন্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শোনা যায়, এইবারও জগদ্ধাত্রীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি নিরস্ত হন। বলা হয় দেবী দুর্গার পুনর্জন্ম হয়েছিল মা জগদ্ধাত্রী রূপে। মা সারদা ছিলেন যেন দেবী জগদ্ধাত্রীর পুনর্জন্ম।

নিজস্ব প্রতিনিধি

তথ্য সূত্র:

Hindu Gods and Goddesses, Swami Harshananda, Sri Ramakrishna Math, Chennai, p. 123

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

প্রবন্ধ জগদ্ধাত্রী-তত্ত্ব : পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮

কেন উপনিষদ, তৃতীয়-চতুর্থ খণ্ড

চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর বিবরণ ও কয়েকটি ভুল তথ্যের কথা- অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রক্তিমা কুণ্ডু

পুজোর পরে হেলদি ডায়েট

পুজোর জন্য মাসখানেক আগে থেকে কত কি ঝক্কি সামলে ওজন কমানোর হিড়িক চলে প্রায় সব বাড়িতেই। বছরের আর পাঁচটা দিন যাই হয়ে যাক এই ক'টা দিন নতুন সাজপোশাকে তন্বী হয়ে উঠতে চান সবাই। কিন্তু পুজোয় প্যান্ডেল হপিং, আর বিজয়ার টুকটাক গেট টুগেদারের পর অবস্থা যে কি সেই! পুনর্মূষিকো ভব!

অগত্যা মাথায় হাত! সামনেই দীপাবলি। ক'দিন একটু তেল-ঝাল থেকে দূরে না-থাকলেই নয়। তবে হেলদি খাবার, আবার খেতেও সুস্বাদু, এ ও কী সম্ভব! বাচ্চা থেকে বড় সকলের পেটের সঙ্গে মন ভরবে এমন তাকলাগানো ১০টি রান্না নিয়ে হাজির রন্ধন বিশেষজ্ঞ রক্তিমা কুণ্ডু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

scan me

Mera Pyar Shalimar...

100% Vegetarian

Shalimar's®

COCONUT OIL • MUSTARD OIL • SUNFLOWER OIL • SHALIMAR'S AYURVEDIC JASMINE COCONUT OIL • AMLA OIL
MOISTURIZING BODY OIL • CHEF SPICES • MEAT MASALA • CHICKEN MASALA • GARAM MASALA • KASHMIRI MIRCH MASALA

স্টাফড সানফ্লাওয়ার

কী কী লাগবে

চিকেন কিমা, কুচানো পেঁয়াজ, আদা-রসুন-লঙ্কা বাটা, কুচানো টোম্যাটো, নুন, Shalimar's হলুদগুঁড়ো, Shalimar's কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, কালোজিরা অথবা কালো তিল, ময়দা, হলুদ খাবার রং অথবা কেশরে ভেজানো দুধ, Shalimar's সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

ময়দা, নুন, অল্প তেল, কেশরে ভেজানো দুধ অথবা হলুদ খাবার রং এবং পরিমাণমতো জল দিয়ে মেখে রাখুন। কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে একে একে চিকেন কিমা পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুন-লঙ্কা বাটা, টোম্যাটোকুচি, নুন, হলুদগুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে রান্না করে নিতে হবে। এবার মেখে রাখা ময়দা, লেচি কেটে দুটো গোল রুটির মতো বেলে নিন। একটা রুটির ওপর পুর রেখে আর একটা রুটি দিয়ে ঢেকে দিন। ধারগুলো কাঁটাচামচ দিয়ে দাগ দিয়ে কেটে মুড়ে দিন যাতে দেখতে সূর্যমুখী ফুলের মতো হয়। এবার মাঝখানে কালোজিরা অথবা কালো তিল দিয়ে তাওয়ায় অল্প তেলে ভালো করে দু পিঠ সেকে নিলেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

স্পিনাচ অমলেট

কী কী লাগবে

ডিম, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, পালং শাক, Shalimar's সাদা তেল, Shalimar's হলুদগুঁড়ো

কীভাবে বানাবেন

ডিমের সাদা অংশ আর কুসুম আলাদা করে নিন। ডিমের সাদা অংশে নুন, গোলমরিচগুঁড়ো আর পালং শাককুচি মিশিয়ে রাখুন। তাওয়াতে তেল ব্রাশ করে অমলেটের মতো ভেজে ফোল্ড করে তাওয়ার একদিকে রাখুন। কুসুমের সঙ্গে নুন আর হলুদগুঁড়ো মিশিয়ে আবার অমলেটের মতো বানিয়ে আগে ভেজে রাখা অমলেট-সহ ফোল্ড করে নিতে হবে। এবার টুকরো করে কেটে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গর্বের ১২৫ বছর
HAPPY
DHANTERAS
Dhanbarsha
OFFER
LUCKY DRAW
with Every Purchase of
₹1000 & above
ASSURED GIFTS
with every purchase of
₹3000 ₹5000
₹7000 ₹10000
₹20000
VALID TILL 15th November
বগলা চরণ কুণ্ডু
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

রোস্টেড ডাক

কী কী লাগবে

বোনলেস ডাক, গলানো মাখন অথবা Shalimar's সাদা তেল, নুন, সয়া সস, চিলি ফ্লেক্স, মধু, ব্রকলি, সুইট কর্ন

কীভাবে বানাবেন

বোনলেস ডাকের পিসগুলোতে গলানো মাখন, নুন, চিলি ফ্লেক্স, মধু একসঙ্গে মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। প্যানে বাটার দিয়ে মাংসগুলো সঁতে করে অল্প জল দিয়ে গ্রেভি মতো বানাতে হবে। ব্রকলি আর সুইট কর্ন নুনজলে হালকা ভাপিয়ে, মাখন দিয়ে তাওয়া বা এয়ার ফ্রায়ারে রোস্ট করে নিলেই প্ল্যাটার তৈরি। ব্রেড অথবা হার্ব রাইস দিয়ে সার্ভ করুন রোস্টেড ডাক।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দুধ মুরগি

কী কী লাগবে

আলু, মুরগির মাংস, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, থেঁতো করা রসুন, চিনি, কাসুরি মেথি, মাখন অথবা Shalimar's সাদা তেল, চেরা কাঁচালঙ্কা, দুধ

কীভাবে বানাবেন

মাংস, আলু, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, থেঁতো করা রসুন, তিমি কাসুরি মেথি মাখন দিয়ে ম্যারিনেট করে দশ মিনিট রেখে, ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে। এরপর গরম জল অল্প দিয়ে চেরা কাঁচালঙ্কা আর দুধ দিয়ে কষলেই তৈরি দুধ মুরগি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

nanighar
ghar se dil tak

Purely
Homecooked
(not Homelike)
Thalis

Veg Thali
Chicken Thali
Fish Thali
Mutton Thali

Starting from
99/-
only*

#MaaKaHaatKaKhana

ORDER NOW

CALL US AT
6289961646 or 6289909399

VISIT US AT
www.nanighar.com

KOLKATA
GURGAON
DELHI

FOLLOW US ON

DOWNLOAD OUR APP FROM
Google play
App Store

অরেঞ্জ টি

কী কী লাগবে

কমলালেবু, চা-পাতা, মধু, পুদিনাপাতা

কীভাবে বানাবেন

কমলালেবুর খোসা দুই ভাগ করে কোয়াগুলো টুকরো করে গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। খোসার গায়ে ছোট ছোট ফুটো করে চা-পাতা দিয়ে ফোটানো কমলার রস ঢেলে চা হতে দিতে হবে। পুরো প্রসেসটা ছাঁকনিতেও করা যাবে। এরপর ওপর থেকে মধু মিশিয়ে পুদিনাপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন অরেঞ্জ টি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফিশ ফ্লোরেনটাইন

কী কী লাগবে

ভেটকি অথবা স্যামন মাছ, নুন, মাখন, রসুনকুচি, পেঁয়াজকুচি, লঙ্কাকুচি, পালং শাক, দুধ, চিজ, চিনি

কীভাবে বানাবেন

ভেটকি মাছের ফিলেতে নুন মাখিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার প্যানে মাখন দিয়ে রসুনকুচি, পেঁয়াজকুচি, লঙ্কাকুচি ভেজে পালং শাককুচি দিয়ে নেড়ে শাক মজে এলে দুধ, চিজ আর ভাজা মাছ দিয়ে ফোটাতে হবে। শেষে মাখন আর চিনি দিয়ে নামালে তৈরি ফিশ ফ্লোরেনটাইন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ডেভিলড এগ

কী কী লাগবে

বিটরুট, ভিনিগার, সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো ডিম, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো

কীভাবে বানাবেন

গ্রেট করা বিটরুটে ভিনিগার মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ওতে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম ডুবিয়ে ফুটিয়ে নিন। সারা রাত ওই ডিমসহ বিট ভিনেগারের মিশ্রণ ফ্রিজে রেখে দিন। পরদিন সকালে কেটে নুন, গোলমরিচ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

লেমন চিকেন

কী কী লাগবে

আদা, রসুন, লঙ্কা, ধনেপাতার ডাঁটা, নুন, টকদই, ময়দা, চিনি, মুরগির মাংস, গন্ধরাজ লেবুর রস, Shalimar's সর্ষের তেল, দই, এলাচ, দারচিনি, Shalimar's হলুদগুঁড়ো, আলু, চেরা কাঁচালঙ্কা, গন্ধরাজ লেবুর পাতা

কীভাবে বানাবেন

আদা, রসুন, লঙ্কা, ধনেপাতার ডাঁটা, নুন একসঙ্গে বেটে নিন। টকদই, ময়দা, নুন, চিনি একসঙ্গে ফেটিয়ে রাখুন। ওতে প্রথম বাটা মশলা মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। মাংসে, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, গন্ধরাজ লেবুর রস, সর্ষের তেল, দই দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখুন। তেল গরম করে এলাচ, দারচিনি, হলুদগুঁড়ো, নুন দিয়ে আলু ভেজে নিন। এবার ওতে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে কষিয়ে নিন। ঢেকে রান্না করুন। মাংস সিদ্ধ হলে পরিমাণমতো জল দিয়ে চেরা কাঁচালঙ্কা, চিনি, গন্ধরাজ লেবুর পাতা দিয়ে ১০ মিনিট মত স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখুন। ওপর থেকে গন্ধরাজ লেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন লেমন চিকেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮

বাংলার নিজের চ্যানেল

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

বাংলা টেলিভিশনের সবথেকে বেশি সময় ধরে চলা কুকিং শো 'রাঁধুনি' পা রাখলো ১৬ বছরে।

এতদিন ধরে আপনাদের রসনা ও হৃদয় জয় করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

'রাধুনি'-তে অংশগ্রহণ করতে চোখ রাখুন আকাশ আটের পর্দায়।

প্রতিদিন, দুপুর ১:৩০ ও বিকেল ৫:৩০

আকাশ আট দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেখতে না পেলে আপনার কেব্‌ল বা ডি টি এইচ অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্রেড পার্সেল

কী কী লাগবে

গ্রেট করা পনির, পেঁয়াজকুচি, নুন, টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, কড়াইশুঁটি, মাখন, পাউরুটির স্লাইস, চিজ, Shalimar's সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

গ্রেট করা পনির, পেঁয়াজকুচি, নুন, টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, কড়াইশুঁটি, একসঙ্গে মাখনে সঁতে করে নিতে হবে। মাখন গলিয়ে ওতে রসুন, মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স মিশিয়ে রাখুন। বেলে রাখা পাউরুটির স্লাইসের উপর ব্রাশ করে পনিরের স্টাফিং আর চিজ ছড়িয়ে মুড়ে নিন। তাওয়াতে বা এয়ার ফ্রায়ারে সেকে নিলেই তৈরি ব্রেড পার্সেল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পালং চিকেন

কী কী লাগবে

চিকেন, পালং শাক কুচানো, পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুন-লঙ্কা বাটা, চেরা কাঁচালঙ্কা, ছেঁচে নেওয়া রসুন, ফেটানো টকদই, নুন, Shalimar's সর্ষের তেল, গোটা গরমমশলা (এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ), গোটা জিরে, মাখন

কীভাবে বানাবেন

চিকেনের টুকরোগুলো চিরে টকদই, আদা-রসুন-লঙ্কা বাটা, নুন, তেল দিয়ে ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তারপর কড়াইয়ে তেল গরম করে একে একে গোটা গরমমশলা ও জিরে ফোড়ন দিতে হবে। গরমমশলা ও জিরে ভাজার গন্ধ বেরোলে একে একে পেঁয়াজকুচি, নুন ও থেঁতো রসুন দিতে হবে। হালকা নেড়েচেড়ে ম্যারিনেটেড চিকেন দিয়ে রান্নাটাকে কিছুক্ষণ হতে দিতে হবে। চিকেন জল ছাড়তে শুরু করলে পালং শাক আর লঙ্কা দিয়ে নেড়ে ঢাকা দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর খুলে খুলে রান্নাটা নাড়তে হবে যতক্ষণ চিকেন পুরো সিদ্ধ না-হচ্ছে। এসময় দরকার হলে অল্প জল দিতে হবে। নামানোর আগে বাটার দিয়ে নাড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com